প্রকাশকাল : ইং ২৬ আগষ্ট, ১৯৫৮

প্রকাশক :

শ্রীদ্বিজদাস কর

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০৯

ফোন : ৩৫-৭৯১৩

মুদ্রাকর :

শ্রীকালীশঙ্কর গুহ

সরযূ প্রেস

চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী।

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

পরিশিষ্ট :

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোসানী মন্দিরের বহির্ভাগস্থ প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার।
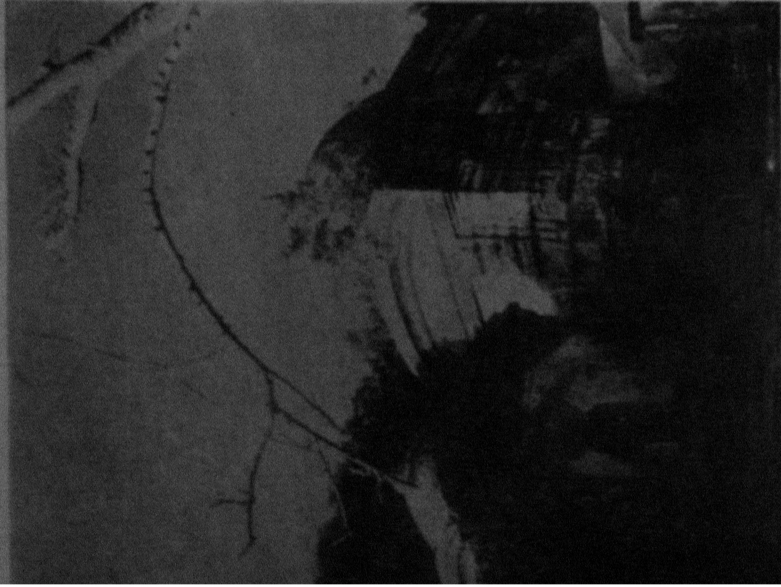
গোসানী দেবীর নাটমন্দির ও মূল মন্দির।

কান্তেশ্বর রাজার রাজপাটের ঢিবি (স্তূপ)
ও অলংকৃত প্রস্তর খণ্ড।

গ্রন্থ-পরিচিতি

তরুণ গবেষক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ পাল বেশ কিছুকাল ধরে কোচবিহার অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যের গবেষণায় গভীর নিষ্ঠা নিয়ে লিপ্ত আছেন। তাঁর ব্যাপক পরিকল্পনার আংশিক প্রকাশ আমরা দেখতে পেয়েছি তৎসম্পাদিত রিপুঞ্জয় দাস ও অন্যান্য -রচিত 'মহারাজবংশাবলী'তে। এবারে তিনি আমাদের হাতে তুলে দিলেন রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী -রচিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যের আধুনিকতম সংস্করণ। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। সুতরাং অধুনা দুর্লভ এই গ্রন্থটির একটি নতুন সুসম্পাদিত সংস্করণ ছিল প্রত্যাশিত। শ্রীপাল সাগ্রহে এই গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। 'গোসানীমঙ্গলে'র সব পুঁথির বিবরণ একরূপ নয় বলে জানিয়েছেন 'কোচবিহারের ইতিহাস'-রচয়িতা আমানতুল্লা আহমেদ সাহেব। সম্ভবতঃ ঐ সব পুঁথির লেখকও ভিন্ন ভিন্ন। রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী -রচিত এই পুঁথিখানি খুব প্রাচীন নয়, ১২৩১ বঙ্গাব্দে (১৮২৫ খৃঃ) লিখিত নষ্টপ্রায় একখণ্ড হস্তলিপি থেকে নাকি এটি মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশক ব্রজচন্দ্র মজুমদার বিজ্ঞাপনে 'গোসানীমঙ্গল'কে কোচবিহারের আদিকাব্য বলে দাবী করেছিলেন। মজুমদার মহাশয় যখন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখনও পর্যন্ত কোচবিহারের রাজকীয় গ্রন্থাগারে (অধুনা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে) এবং কোচবিহার সাহিত্য সভায় সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথি-সমূহের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নি, তাই তাঁর পক্ষে সে সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তাঁর সময়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত এই কাব্যকেই তিনি আদিকাব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন মনে হয়। কোচবিহারের সাহিত্য-ঐতিহ্য কিন্তু বেশ প্রাচীন, পুঁথিধৃত সাহিত্য তো সে কথাই বলে। যা হোক আদি কাব্য যদি নাও হয়, তবু 'গোসানীমঙ্গলে'র উল্লেখযোগ্যতা কিছুমাত্র কম বলা যায় না। গোসানী-নামধেয় লৌকিক দেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করে যে কাব্যকাহিনী কোচবিহার অঞ্চলে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রচিত হয়েছিল, তার অনুরূপ জনপ্রিয় আর কোন কাব্য আমাদের গোচরে আসে নি। সুতরাং আঞ্চলিক সাহিত্যের মধ্যে এটি উল্লেখ্য।

প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে—'গোসানী' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি ? স্থানের নামই বা 'গোসানীমারি' কেন ? 'গোস্বামী' থেকে 'গোঁসাঞি' হয়েছে তা' সহজেই বুঝি। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সব দেবদেবীমূর্তিকেই বলা হয় 'গোঁয়াই' (গোঁসাই)। চণ্ডী হলেন ঐ নামে উদ্দিষ্টা দেবী, তাই গোঁসাঞি + নী (স্ত্রী প্রত্যয় করে)—'গোসানী' হওয়া স্বাভাবিক। অধ্যাপক ডঃ নির্মল দাশ কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 'দেবী' অর্থে গোসানী শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করেছেন। তিনি আরও বলেন—শব্দকল্পদ্রুমের অর্থানুসারে মারি=চণ্ডী। সুতরাং গোসানীমারি=দেবী চণ্ডী বা চণ্ডী দেবী। কিন্তু 'কোচবিহারের ইতিহাস'-রচয়িতার মতে গোঁসানীমারি<গোসানীমারই বা দেবীস্থান। স্থান অর্থে 'মারি'র প্রয়োগ আরও রয়েছে দেখতে পাই। যেমন শোলমারি, চাঁদমারি, বাগমারি। 'মারি' বাংলায় আগত অনার্য শব্দ কি ? ভাষা-তাত্ত্বিকরা বলতে পারবেন।

যা হোক, গোসানীদেবী ও তাঁর পীঠস্থান গোসানীমারির মন্দির এবং তৎসংশ্লিষ্ট অলৌকিক কিম্বদন্তী বিজড়িত ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা কৌতূহলী, এই 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবে। সেই সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে ভক্তি ও বিশ্বাসের আবেদন। প্রস্তুত সংস্করণের সম্পাদক শ্রীপাল এই কাব্যের পটভূমিরূপে প্রাচীন ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর নিপুণ বিশ্লেষণ করে আমাদের পুরাবৃত্ত-সচেতন করেছেন এবং সেই সঙ্গে ব্রজচন্দ্র মজুমদার-কৃত প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টসমূহ পুনরায় এখানে যুক্ত করে কামতাপুর ও কামতেশ্বরী মন্দিরের ইতিবৃত্ত ও বর্তমান অবস্থা জানতে সাহায্য করেছেন। কান্তেশ্বরের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও রাজ্যচ্যুতিঘটিত কিম্বদন্তী মনে হয় বহু প্রাচীন। 'খেন' (Khen) রাজাদের পতন ঘটে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে। এঁদের পরেই চন্দনকে দিয়ে কোচ্ রাজবংশের সূচনা হলো ১৫১০ সালে। তিনজন 'খেন' রাজাকে ঘিরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কিম্বদন্তী পুরাকালে গড়ে উঠেছিল। প্রথম রাজা নীলধ্বজ, ইনি পরিচিত ছিলেন কান্তিনাথ নামে। এঁর বাল্যকাল, গোচারণ-কাহিনী ও রাজা হওয়ার কাহিনী কৌতূহলজনক। দ্বিতীয় রাজা চক্রধ্বজ ও তাঁর কবচ-কাহিনী এবং তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের রাণীঘটিত কাহিনীর করুণ পরিণতি ও রাজ্যলোপের কথাও কিম্বদন্তী। 'গোসানীমঙ্গলে'র কবি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী ঐ তিনজন রাজার তিনটি কিম্বদন্তীকে একত্র করে আরোপ করেছেন কাব্যের নায়ক কান্তেশ্বরের উপর এবং তাঁকে কেন্দ্র

করেই রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও রাজ্যলোপের ঘটনা বিবৃত করেছেন। তাতে কাহিনীটি পৌর্বাপৌর্য পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। 'কান্তেশ্বর' নামটিও যেন তিন রাজাকে জড়িয়ে প্রযুক্ত হয়েছে, যেহেতু তিনের কাহিনী বর্তেছে একের উপর। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'The Coooh Behar State' গ্রন্থে লিখেছেন— 'The general title of honour of this line of Kings (Khen Kings) was Kanteswara or কামতেশ্বর, the lord of Kamta.' অনুরূপভাবে গোসানীদেবীও কান্তেশ্বরী বা কামতেশ্বরী। কবি বলেছেন—

কান্তেশ্বর হল গোসানীর অধিকারী।
সেই হেতু তাঁর নাম হল কান্তেশ্বরী॥

কোচবিহারের প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস নানা জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তীতে আকীর্ণ। তার মধ্যে 'গোসানীমঙ্গলে' বিধৃত তিনটি কিম্বদন্তী একদিকে যেমন অলৌকিক, অপরদিকে তেমনি রোমাঞ্চকর লৌকিক প্রণয়রসে পরিপূর্ণ। রাজ্যের সূচনায় রয়েছে দেবীর অলৌকিক অনুগ্রহ, রাজ্যের ধ্বংসে সক্রিয় হয়েছে মানুষের অবৈধ প্রণয়লীলা। বহু পরিচিত 'কালিকামঙ্গল' কাহিনীর নায়কের সুরঙ্গপথে নায়িকার কাছে উপস্থিতি-রূপ রোমান্স বিলাস বাংলা কাহিনীকাব্যে যেন এক দুর্মর ঐতিহ্য। গোসানীমঙ্গলের কবিও অনুরূপ চিত্র অঙ্কনে প্রলুব্ধ হয়েছেন কাব্যকে লৌকিক রূপ দেবার অভিপ্রায়ে। তাঁর প্রেমিক মনোহর সুরঙ্গপথে অভিসার করেছে রাণী বনমালার কাছে, কিন্তু তার পরিণতি হয়েছে খুবই শোকাবহ; কালিকামঙ্গলের মত তা অলৌকিক সুখ সমাপ্তিতে ভরে ওঠে নি। যা হোক, বিস্ময়, বীভৎস ও করুণ রসের সঞ্চারে কাহিনীটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।

সম্পাদক শ্রীপাল 'গোসানীমঙ্গল'কে পরিপূর্ণ মঙ্গলকাব্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাই কি? আমার মনে হয়, এটি মূলতঃ ব্রতকথাজাতীয়, বাংলার নানা অঞ্চলের স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে একদা এই ধরনের ক্ষুদ্রাবয়ব পদ্য রচনা কম হয় নি। আবার তার কোন কোনটিকে ভাঙ্গ করে বিরাট মঙ্গলকাব্যও গড়ে উঠেছে। মঙ্গলাচরণ, দেবীর আদেশে কাব্যরচনা, নায়ক শাপভ্রষ্ট দেবসন্তান, গর্ভিণীর নানা দৈহিক লক্ষণ, বিশ্বকর্মার নগর নির্মাণ, দেবীপূজা, কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ সামান্যভাবে থাকলেও এবং নামে 'মঙ্গল' হলেও কিন্তু 'গোসানীমঙ্গল'কে

সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্য বলতে বাধে। মঙ্গলকাব্যের বিস্তার ও বর্ণনাবাহুল্য এতে নেই। মনে হয়, এটি সম্ভাবনাপূর্ণ একটি মঙ্গলকাব্যের খসড়া। ব্রতকথার মত রচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে কোন সুস্পষ্ট চরিত্র যেমন ফুটে ওঠে নি, তেমনি কবির কবিত্বপ্রকাশের সুযোগও এতে ঘটে নি। তবু কবচের একটু বর্ণনা মন্দ নয়।

চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া কবচ গোটা জ্বলে।
বহু দিন গত তবু আছয়ে উজ্জ্বলে॥

আমাদের আশা ও বিশ্বাস এই যে, পুনঃপ্রকাশিত ও সুসম্পাদিত এই 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য শুধু কোচবিহারের আঞ্চলিক সাহিত্যের নিদর্শনরূপেই গৃহীত হবে না সমগ্র বাংলা সাহিত্যের আখ্যানকাব্যধারায় উল্লেখ্য সংযোজনরূপেও সমাদৃত হবে।

পূর্ব্বাভাষ

ইতিহাসের বহু কাহিনী বিজড়িত অর্দ্ধভগ্ন গোসানীদেবীর মন্দির ও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কান্তেশ্বরের গড় মহাকালের গ্রাস হইতে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া দিনহাটার গোসানীমারী অঞ্চলে দাঁড়াইয়া আছে। এই গোসানীমঙ্গল কাব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহার ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত। জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দেবী যেখানে চণ্ডী, কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে চণ্ডীর মহিমা যেখানে বিধৃত, সেইখানে দেবীর নাম কেমন করিয়া গোসানী-দেবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

আমরা লক্ষ্য করি এই মঙ্গলকাব্য গোসানীদেবীর মাহাত্ম্যকে বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু কোথাও দেবীর নাম গোসানীদেবী নাই, স্বাভাবিক ভাবে গোসানীমারী এবং গোসানীদেবী নামের উৎপত্তি লইয়া আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। স্থানীয় কোন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির মতে এই অঞ্চলে এককালে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব ভক্ত গোঁসাই বাস করিতেন। সেই অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হয় গোঁসাইবাড়ী>গোসানীবাড়ী>গোসানীমারী। আর এই অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শেষ পর্যান্ত দাঁড়ায় গোসানীদেবীতে। অন্যমতে কামতাপুরের রাজা কান্তেশ্বর গোঁসাই বসতি অঞ্চলে অধিষ্ঠাত্রী চণ্ডীদেবীর পূজা প্রবর্তন করেন; প্রতি গৃহে এই দেবীর পূজার প্রচলন হয়। ঘরে পূজিত বলিয়া এই অঞ্চলের দেবীকে "ঘর-গোসানী" বলা হইত। অদ্যাবধি ঠাকুরঘরকে স্থানীয় ভাষায় "মারেয়াঘর" বলে। গোসানী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মন্দির ও তৎসংলগ্ন স্থানটিকে গোসানীমারই বলা হইত, পরবর্তী কালে যাহা গোসানীমারীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। মারেয়ার আভিধানিক অর্থ সেবাইৎ। এই অর্থকে গ্রহণ করিলে মনে করা যায় গোসানীর সেবাইৎদের থাকার বাড়ী গোসানীবাড়ী বা গোসানীমারী। আর-একটি মতে হোসেন শাহের আক্রমণকালে এই অঞ্চলের বিষ্ণুভক্ত গোঁসাইদের হত্যা করা হয়, সেই ঘটনাকে স্মরণীয় রাখার উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের নাম গোসানীমারীতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, কারণ যাহাই হউক না কেন, গোসানী অঞ্চলের নাম অনুসারেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডীকার নাম গোসানীদেবী হয়। আবার অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন

গোসাইনী হইতে গোসানী নামের উৎপত্তি। গোসানী নামটি 'গোসাপিনী' হইতে আগত— এইরূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবী চণ্ডী গোসাপের রূপ ধরিয়া কালকেতুর সম্মুখে বনপথে পড়িয়াছিল এবং কালকেতু অন্য শিকার না পাইয়া ক্ষুব্ধমনে তাহাকেই বাঁধিয়া ঘরে আনে। পরে কালকেতু ও ফুল্লরার অনুপস্থিতিতে সেই স্বর্ণ গোধিকা (গোসাপ) অপরূপ নারীমূর্তির রূপ ধারণ করে। সেই নারীই দেবী চণ্ডী। গোসাপ স্ত্রীলিঙ্গে গোসাপিনী>গোসানী হওয়াও বিচিত্র নয়। গোসানী বহুবার দেবী চণ্ডী রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং গোসানী যে চণ্ডীরই নামান্তর ইহাতে কষ্টকল্পনা কোথায়! ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের স্থানীয় লিপিকার শ্রীগোবিন্দ দাস ১২৫১ সনে নিজের ঠিকানা গোসানীমাড়ই বলিয়াছেন। প্রাচীন কামতাপুরের এই অঞ্চলটি বর্তমানে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমায় অবস্থিত। সদর শহর হইতে যাতায়াতের বর্তমানে অনেক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানে আসিলে পর্যটক, দর্শনার্থী বা অনুসন্ধিৎসুদের বেশ কিছু সময় আনন্দেই কাটিবে।

বর্তমান দেউড়ী (পুরোহিত) গোসানীচণ্ডীর কবচ দেখিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তাহার মতে ২৫/৩০ বৎসর হইল ঐ কবচটি চুরি গিয়াছে। চক্ষে দেখা নিষেধ ছিল হাত দিয়া অনুমান করা যাইত। বস্তুটি ত্রিভুজাকৃতি, তবে কিসের তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কৌটাটি ছিল সোনার। নিত্য পূজার সময় চোখ বন্ধ রাখিয়াই চন্দন ইত্যাদি লেপন করিতে হইত। ঐ সময়ে সিংহাসনে রূপা ছিল এক মন দশ সের। কোচ বিহারের ধর্মপ্রাণ অধিপতি প্রাণনারায়ণ বর্তমান মন্দির স্থাপন করিয়া দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বিহার প্রদেশের দ্বারভাঙ্গা জিলার উজান গ্রাম নিবাসী রতিনাথ ঝা-কে স্বপ্নাদেশ মত মন্দিরের পুরোহিত হিসাবে নিয়োগ করেন। তাহার পর হইতে বর্তমান বার পুরুষ ধরিয়া বংশ-পরম্পরায় তাহারাই দেউড়ীর কাজ করিয়া আসিতেছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার অঞ্চলে দুর্গাবরী বাংলা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের মধ্যে গোসানী-দেবীর নাম পাই। যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী -প্রণীত কোচবিহারের ইতিহাসে (১৮০৩) গোসানীমারীর অপর নাম কান্তাপুর বলা হইয়াছে।

এই গোসানীদেবীর মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করিয়া কোচবিহারের লোকপ্রিয় গোসানীমঙ্গল কাব্যটি গ্রথিত হইয়াছে। এই কাব্যের কবি শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস।

কোচবিহারে যে সাহিত্য-সাধনার প্রবাহ শুরু হইয়াছিল তাহার প্রধান কেন্দ্র ছিল রাজদরবার। রাজ আনুকূল্যে এই সাধনার জন্ম ও বৃদ্ধি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি তাহার পাশে পাশে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল রাজ আনুকূল্য-নিরপেক্ষ এক সাহিত্যধারা। তারই অন্যতম উজ্জল নিদর্শন স্বভাবকবি রাধাকৃষ্ণ দাস-রচিত বহু আদৃত কোচবিহারের এই 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য। ঐতিহাসিক ও লৌকিক তথ্যে পরিপুষ্ট এই কাব্যখানি আলোচনার পূর্ব্বে এই কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

গোসানীমারীর মন্দিরে দেবী চণ্ডীর কোন মূর্ত্তি নাই। রাজা ভগদত্তের কবচকে দেবী চণ্ডীর প্রতিভূ মনে করিয়া পূজা করা হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে ভগদত্ত কে? তাহার কাছে দেবী চণ্ডীর এই শক্তিকবচ কি করিয়া আসিয়াছিল এবং কি ভাবে এই কবচ এই অঞ্চলে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? ইহার উত্তর দিতে গিয়াই এই কাব্যের সৃষ্টি। এই কাব্যে মহাভারতের কাল হইতে এই অঞ্চল তথা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কথা পাই। মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব্বে উল্লেখ আছে, যেমন সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের সঙ্গে ভগদত্তের যুদ্ধের বর্ণনা। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অন্যান্য রাজাদের সহিত তাহার উপস্থিতি। শ্রীকৃষ্ণ নরককে সুদর্শন চক্রদ্বারা বধ করিয়া তাঁহার পুত্র ভগদত্তকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধিপতি করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্ব, উদ্যোগপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব ও দ্রোণপর্ব্বে ভগদত্তের বিভিন্ন বীরত্ব কাহিনীর উল্লেখ আছে; গোসানীমঙ্গল কাব্যেও এই কাহিনীগুলির বিভিন্ন বর্ণনা কাব্যসুষমাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতে ভগদত্তকন্যা ভানুমতীর সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহের কথাও আমরা পাই। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভগদত্ত এক অক্ষৌহিনী সৈন্য লইয়া কুরু পক্ষে যোগদান করেন এবং একযোগে বার দিন প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ছলনায় অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। চক্রব্যূহ রচনা কালে অন্যান্য বীরদের মধ্যে ভগদত্ত ছিলেন। ইন্দ্রসখা ভগদত্ত শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত কবচ কুণ্ডল মহাশক্তি চণ্ডী তথা গোসানী কবচ নামে এতদ্‌অঞ্চলে খ্যাত হইয়াছে। এই কবচ-উদ্ধার বিষয়ে কাহিনীর পূর্ব্বসূত্র এই কাব্যে দেখান হইয়াছে। মহাভারতে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়াও কালিকাপুরাণে নরকের পুত্রগণের মধ্যে ভগদত্তের নাম পাওয়া যায়। তারপর আর কোন ঐতিহাসিক তথ্য এ বিষয়ে পাওয়া

যায় না। প্রাচীন ইতিহাসের ছিন্ন খণ্ডগুলিকে একত্রিত না করা পর্যন্ত এ অঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা দুঃসাধ্য।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন এই কাব্যের ঐতিহাসিক পরিবেশ এবং কাব্যের অন্তঃস্থিত বিভিন্ন কাহিনীর বিভিন্ন দিক এবং তাহাদের প্রাসঙ্গিকতা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, দুর্লভ-নারায়ণ ১২২৫ খৃষ্টাব্দে কামতারাজ্যের রাজা হন। এই সময়ে কামতারাজ্যের সীমা পূর্বে বড়নদী (কামরূপ) আর পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরে ভোট আর দক্ষিণে গারোপাহাড়, বোধ হয় উত্তর-দক্ষিণে সীমা ছিল। এই কালে কামরূপের বিভিন্ন নাম ছিল, যেমন কামতা>কামদা> কমতা>কামরূপ-কমদা। শঙ্কর চরিতে কামতেশ্বরকেই স্থল বিশেষে কামেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুর্লভনারায়ণের অপূর্ব সুন্দরী প্রধানা মহিষীর নাম ছিল সুশুদ্ধি। তিনি ছিলেন গৌড়েশ্বরের কন্যা। কামেশ্বরের পুরোহিত নীলাম্বরের দীননাথ, চন্দ্রভান এবং চন্দ্রশেখর নামক তিন পুত্র ছিলেন। ইঁহারা গোপনে রাজমহিলাগণকে হরগৌরী-সংবাদ পুঁথি শ্রবণ করাইতেন। চন্দ্রশেখর রাজার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং সেই সুযোগে তিনি রাজান্তঃপুরে দুষ্কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। রাজার আদেশে শাওনা, ছলিহা, জোগাই এবং ধনেশ্বর গুয়াকাটা প্রভৃতি কর্মচারীগণ চন্দ্রশেখরকে কারারুদ্ধ করেন এবং রাণী সুশুদ্ধিও বন্দিনী হন। শত্তানন্দ এবং সতীবার সেই অবমাননায় মর্মাহত হইয়া গৌড়েশ্বরের শরণাপন্ন হন। রাণী সুশুদ্ধিও পুরোহিত পুত্র দীননাথের দ্বারা স্বকীয় অবস্থা গোপনে পিতাকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন.........পরে গৌড়েশ্বর কামতাপুর আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন (আমানতউল্লা আহম্মদ -লিখিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' পৃষ্ঠা-৩৭)। এই ঐতিহাসিক কাহিনীর বিভিন্ন অংশ আমরা গোসানী-মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখিতে পাই। কিন্তু চরিত্রগুলির নামের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

পাল রাজত্বের শেষে আমরা এই অঞ্চলে আর-এক নূতন রাজবংশের নাম পাই। ঐতিহাসিকদের মতে এই খেন বা সেন বংশের প্রথম রাজা হন নীলধ্বজ। রাজবংশী অভিধানে তাঁহাকে আবার কান্তেশ্বর বর্মন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কাহিনীর সঙ্গে গোসানীমঙ্গল বর্ণিত বিষয়ের প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ মিল দেখা যায়। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহার

The Cooch Behar State গ্রন্থের ২২০ পৃষ্ঠায় যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।—

রাজাবিহীন অবস্থায় যখন চারিদিকে ক্ষমতার যুদ্ধ চলিতেছিল তখন কামরূপে নীলধ্বজ রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। তাঁহার ডাক নাম ছিল কান্তনাথ। পিতার নাম ছিল ভক্তিশ্বর এবং মাতার নাম ছিল অমলা। তাঁহারা শিঙ্গিমারী নদীর তীরে জামবাড়ী তালুকে বাস করিতেন। কান্তেশ্বরের পাঁচ বৎসর বয়সকালে পিতার মৃত্যু হয়। এই শিশুপুত্রকে প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণ রাখালরূপে নিযুক্ত করেন। এইভাবেই দিন চলিতে থাকে। বিভিন্ন স্থান হইতে শস্য নষ্ট করার অভিযোগ শুনিয়া একদিন ব্রাহ্মণ দেখেন যে বালক কান্তনাথ বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছে। আর একটি বৃহৎ আকার গোক্ষুরা সাপ ফণা তুলিয়া তাঁহাকে রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। বিস্মিত ব্রাহ্মণ ঘুমন্ত বালকের হাতে এবং পায়ে রাজ লক্ষণ দেখিয়া কিছু না বলিয়া চলিয়া যান এবং ঐদিন হইতেই তাহার রাখালিয়া কাজ বন্ধ হয়। ব্রাহ্মণ কান্তনাথের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, কান্তনাথ যদি কোনদিন রাজা হইতে পারেন তবে তাঁহাকে রাজগুরুপদে নিযুক্ত করিবেন। দিনগতে কান্তনাথ কামরূপের রাজা হন এবং নিজের প্রতিজ্ঞা মত কাজ করেন। তিনি মিথিলা এবং ত্রিহুত হইতে ব্রাহ্মণদের আনয়ন করেন। বৈদিক দেবদেবীর উপাসনা পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। নীলধ্বজ ধরলা নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করেন। তথায় পারিবারিক দেবতা হিসাবে কামতাপুরের দেবী কান্তেশ্বরীকে স্থাপনা করেন। সেইজন্য রাজাকেও কান্তেশ্বর>কামতেশ্বর বা কামতারাজ্যের ঈশ্বর বলা হইত।

নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই গোসানীমারীর পবিত্রস্থান আবিষ্কৃত হয়। গোসানীর কোন মূর্ত্তি নাই। কবচই গোসানীরূপে পূজিত হয়। অনুমান করা হয়, সেই ভগদত্তের কবচ যাহা কুরুক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। একটি বাজপাখী সেই কবচসহ খণ্ডিত হস্তটি লইয়া উড়িয়া যাইবার পথে কামতারাজ্যে পতিত হয়। যাহা "স্ফটিক কুড়ার" পার্শ্বে শিমুল বৃক্ষের নীচে ছিল। মধুআলির মারফৎ রাজা জানিতে পারেন যে স্ফটিক কুড়ার পার্শ্বে শিমুল বৃক্ষের নীচে ঐ কবচটি রহিয়াছে। তাহার পর উহা উদ্ধার করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন।

চক্রধ্বজের পরে তৃতীয় এবং এই রাজবংশের সর্বশেষ রাজা হন নীলাম্বর। তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় এখানে আলোচনা করিতেছি। কেননা এই অংশের সহিত গোসানীমঙ্গল কাহিনীর মিল দেখা যায়। নীলাম্বরের পাঁচজন রাজমহিষীর মধ্যে কনিষ্ঠাই ছিলেন তাঁহার বিশেষ প্রিয়। কিন্তু রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে, মন্ত্রী শচীপাত্রের পুত্র মনোহরের সহিত কনিষ্ঠা মহিষী অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত, তখন কৌশলে মনোহরকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন এবং মহিষীকে তাঁহার মাংস রান্না করিতে আদেশ দেন এবং শচীপাত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ মাংস আহার করান। এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার আশায় শচীপাত্র গঙ্গা স্নানে যাইবেন বলিয়া বাহির হইয়া হোসেন শাহের দরবারে গিয়া হাজির হন এবং তাঁহাকে কামতারাজ্য আক্রমণের পরামর্শ দেন। বার বৎসর যুদ্ধের পর কুট চাল চালিয়া হোসেন শাহ তাঁহাকে পরাস্ত করেন। আচার্য্য যদুনাথ সরকারও এই তথ্য সমর্থন করিয়াছেন (The History of Bengal, Vol. II, 1948, Page 146)। তারপর তিনি পরাজিত রাজাকে বন্দী করেন এবং রাজপরিবারের মহিলাগণ স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। নীলাম্বরকে যখন লোহার খাঁচায় করিয়া গৌড় লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন কাজলী কুড়ায় তিনি পিতৃ-তর্পণ করিতে অনুমতি চাহিলে তাঁহার শেষ ইচ্ছা পূরণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি জলে নামিয়া সেই যে ডুব দিলেন আর উঠিলেন না। এখানে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে চণ্ডী গোসানী তাঁহার ভক্তকে কোলে স্থান দিয়াছিলেন।

গোসানীমারী অঞ্চলে সাধারণ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে মনোহর এবং বনমালার মধ্যে অবৈধ প্রেম ছিল না, ছিল শিল্পী এবং শিল্প-রসিকের স্বর্গীয় সম্পর্ক; যে সম্পর্কের কথা ক্রোধান্ধ রাজার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না; কারণ তাহা না হইলে অসতী রাণীর পাষাণ হওয়ার কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মতে মনোহর খুব ভাল গান করিতে পারিতেন জানিতে পারিয়া রাণী গান শোনার ইচ্ছায় তাঁহাকে রাজপুরী মধ্যে লইয়া যান। এই কথা রাজা জানিতে পারিয়া অন্তঃপুরে পরপুরুষের আগমনকে নিষেধ করিয়া দেন; কিন্তু রাণী এতই মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহার গান না শুনিলে কিছুই ভাল লাগিত না আর মনোহরেরও রাণীকে গান শুনাইতে না পারিলে তৃপ্তি হইত না। আকস্মিক বাধা আসাতে রাণী লুকাইয়া গান শোনার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে মনোহরকে ফাঁদ পাতিয়া

আটকানো এবং তাহার করুণ পরিণতি ইত্যাদি কাহিনী একই ধারায় চলিয়াছে।

আমানতউল্লা লিখিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' (পৃষ্ঠা ৩৮) পুস্তকের তথ্য অনুসারে কাছাড়ের বিলুপ্ত রাজবংশের ত্রিপঞ্চাশতম রাজা নির্ভয়নারায়ণের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সহিত গোসানীমঙ্গলের লিখিত কান্তেশ্বরের সর্প স্পর্শাদি অলৌকিক ঘটনায় প্রায় ঐক্য রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় মনে হয় যে, কাছাড়ী সংস্রবের ফলে উক্ত কাহিনী এতদ্‌ঞ্চলে আনীত হওয়া অসম্ভব নহে। কামতাপুর-বিজেতা হোসেন শাহ বাল্যজীবনে এক ব্রাহ্মণের গোপালক ছিলেন এবং নিদ্রাবস্থায় তাঁহাকে সর্প ছায়া দান করিত ইহাও কথিত হইয়া থাকে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলার ইতিহাস" (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭১, পৃষ্ঠা ১২৩) গ্রন্থে Gait's "History of Assam" (পৃষ্ঠা ৪১, ৪২, ৪৩) হইতে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "আহম্‌ ভাষায় লিখিত বুরঞ্জী অনুসারে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনা কামতাপুরের খেন রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কামতাপুরের রাজা নীলাম্বরের ব্রাহ্মণ-জাতীয় মন্ত্রীর পুত্র রাজান্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করায় নীলাম্বর মন্ত্রীপুত্রকে হত্যা করিয়া পিতাকে পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মন্ত্রী পুত্রের পাপস্থালনের জন্য গঙ্গাস্নানের ছলে গৌড়ে হোসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ সেই ব্রাহ্মণের নিকট খেন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কামতাপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কামতাপুর অবরোধ করিয়া খেন রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে, হোসেন শাহ বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নীলাম্বরকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী নীলাম্বরের পত্নীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকায় মুসলমান সেনার কিয়দংশ কামতাপুর নগরে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিয়াছিলেন। নীলাম্বর বন্দীরূপে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পথে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।" এই অংশে নীলাম্বর মন্ত্রীকে ক্ষত্রিয়স্থলে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। হোসেন শাহের পত্নীর নীলাম্বরের পত্নীর সাক্ষাৎ প্রার্থনায় নগর-প্রবেশ এবং পরাজিত নীলাম্বরের পলায়ন প্রভৃতি তথ্য অন্যত্র পাওয়া যায় না।

রাখালদাস বর্ণিত এবং গোসানীমঙ্গলে গ্রথিত মন্ত্রীপুত্রের সহিত রাণীর অবৈধ প্রণয়ের অনুরূপ কাহিনী বিদেশী উপকথাতেও পাওয়া যায়। বলা

হইয়াছে, "চরিত্রগুলোর ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু একদা বহুল প্রচলিত এই উপকথার পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাসের সমর্থন নেই।" কাহিনীটি এইরূপ : দুর্গের অধিশ্বরী সেরেমণ্ডার এক হতভাগ্য ত্রুবাডুর কবি Guilhem-এর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার স্বামী দুর্গাধিপতি রেমণ্ড কবিকে হত্যা করান এবং তাহার ছিন্ন হৃদপিণ্ড উপভোগ্যভাবে রন্ধন করাইয়া সান্ধ্যভোজে তাঁহার স্ত্রীকে খাওয়ান। সেরেমণ্ডা তাঁহার প্রণয়ীর পরিণতির কথা জানিয়া আত্মহত্যা করেন। ("সেরেমণ্ডার শেষ ভোজ"—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও কবিতা, দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৬৩ ; ১৩৮৪)।

পূর্ব-আলোচিত খণ্ড খণ্ড কাহিনীগুলি হইতে স্পষ্টই ধারণা করা যাইতে পারে যে, ইতিহাস এবং পল্লী কবির রচিত কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য সামান্য। এখানে গোসানীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল :—

"মঙ্গলাচরণের পর আকাশবাণীর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া গ্রাম্যকবি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী গোসানীমঙ্গল রচনা করেন। বেহারের জামবাড়ী গ্রামের অঞ্জনা কায়মনোবাক্যে শিব পূজা করিতেন। পরে স্বামী ভক্তিশ্বরের মুখে চণ্ডীর মাহাত্ম্য শুনিয়া চণ্ডীর পূজা করিতে মনস্থ করিলে আকাশবাণীতে পূজা পদ্ধতি অবগত হইয়া তিনি ভক্তিভরে চণ্ডী পূজা করিলেন। নিদ্রাকালে স্বামী-স্ত্রী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন এবং জানিতে পারেন চণ্ডীর বরে তাঁহাদের এক পুত্র হইবে এবং সে রাজা হইবে। চণ্ডী শিয়রে বসিয়া এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে পুত্রলাভে আনন্দে ঘর ভরিয়া গেল। পূর্ব নির্দ্দেশমত পুত্রের নাম রাখা হইল কান্তনাথ। পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল। এই গরীবের ঘরে বস্ত্র অলঙ্কারের যে অভাব তাহা চণ্ডী শুনিয়া পূরণ করিয়া দিলেন। এর মধ্যেই ভক্তিশ্বর দেহত্যাগ করিলে দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইল। এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কান্তনাথ রাখাল বালকের কাজ আরম্ভ করিলেন। নিত্য গোচারণ করিতে গিয়া তাঁহার মহাসুখে নিদ্রা যাওয়ার এবং গরুগুলির অন্যের শস্য নষ্ট করার বহু অভিযোগ পাইয়া একদিন ব্রাহ্মণ বনে গিয়া দেখেন কান্তনাথ বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছেন ; তাঁহার মস্তকে এক বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া রৌদ্রের তাপ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহার হাত-পায়ে রাজ-লক্ষণ দেখিয়া ব্রাহ্মণ আরও আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। সন্ধ্যায় নিদ্রাভঙ্গের পর কান্তনাথ গাভীগুলিকে না পাইয়া রোদন করিতে করিতে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আপ্যায়ন করিয়া বলিলেন যে,

গাভীগুলি নিজেরাই বাড়ীতে আসিয়াছে। তাহার পর ব্রাহ্মণ-পরিবারের আদর যত্নে কান্তনাথ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণ কান্তনাথের স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইলেন যে যদি সে কোনদিন রাজা হয় তবে সে ব্রাহ্মণকে রাজগুরু করিবে। রাত্রিতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত করিলেন। প্রভাত কালে চণ্ডী শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন দেখাইলেন যে, কাজলী কুড়ায় স্নান সমাপন করিয়া পূর্ব্বমুখে পরপর মকর, কুমীর, সর্প এই তিন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সে দেখিতে পাইবে। মকর ধরিলে তাঁহার বংশ চিরকাল থাকিবে; কুমীর ধরিলে বংশ বৃদ্ধি পাইবে। আর সর্প ধরিলে সে নির্ব্বংশ হইবে। পর দিন যথারীতি মকর, কুমীর দেখিয়া তিনি ভয়ে ধরিতে পারিলেন না। তারপর সর্পের পিছন দিক স্পর্শ করিলে দেবী সর্পরূপ ছাড়িয়া বলিলেন, 'এক পুরুষের তরে হবে দণ্ডধর।' দেবীর নির্দ্দেশে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার জন্য সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এই রাজপ্রাসাদের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এই কাব্যে দেওয়া আছে। রাত্রির মধ্যেই সব কিছু নির্ম্মিত হইল। পরদিন চণ্ডীর নির্দ্দেশমত মহাসমারোহে কান্তনাথ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

চণ্ডীর ইঙ্গিতে হাতী ঘোড়া সমস্ত কিছু আসিয়া গেল। দোকানপাট, লোকজন সব হইল। শশীপাত্র চণ্ডীর স্বপ্নাদেশেই রাজ্যের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন। আর সেনাপতি হইলেন বীরভদ্র। এই পুস্তকে তাঁহার মাতার মৃত্যু এবং কান্তেশ্বরী-মোহর প্রচারেরও সংবাদ আছে। এখানেও চণ্ডীর স্বপ্নাদেশমত পঞ্চ কন্যা—সুকাঞ্চনা, অকাঞ্চনা, সুশীলা, সুশীতলা আর বনমালার সঙ্গে কান্তেশ্বরের বিবাহ হয়। বিবাহ করিয়া আনন্দিত রাজা জলকেলির আনন্দ উপভোগ করিলেন। তারপর দুর্গা নটীর কাছে উপস্থিত হইলেন। তার গুণেতে মুগ্ধ রাজা দুর্গার নামে পুরী তৈয়ারী করিলেন। অতঃপর রাজা শিকার যাত্রার উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু গণকের গণনায় জানা গেল যাত্রা শুভ নয়। অতঃপর কাজলী কুড়ায় মাছ ধরিতে বলায় কোতোয়াল বহু কষ্টে জালী সংগ্রহ করিয়া জাল ফেলিয়া সহজে কোন মাছ পাইল না। তাহার পর চণ্ডীর নাম করিয়া জাল ফেলিলে এক শোলমাছ ধরা পড়িল। চিল মাছ লইয়া গেলে জালী কাঁদিতে লাগিল। এই দৃশ্যে জালীপত্নী উপহাস-হাস্য হাসিলে দুইজনেই ঝগড়া শুরু করিয়া দেন। কোটাল মাধ্যমে এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য দুইজনেই রাজ সম্মুখে আনীত হন এবং জালীনী পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে শ্রীবৎস রাজার কাহিনীর

উল্লেখ করেন। তারপর ভগদত্তের কবচ-তত্ব এবং তাঁহার বীরত্ব গাথা বিস্তৃত ভাবে রাজ সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। অভিশাপগ্রস্তা ব্রাহ্মণ কন্যার জীবন কাহিনীও সকলকে জ্ঞাত করেন। প্রোথিত ভগদত্তের শক্তি কবচ বিষয়ে রাজা অবগত হইয়া শীঘ্র উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন এবং চমৎকার মূল্যবান "গোসানী" লেখা কবচটি বৃক্ষমূলতল হইতে উদ্ধার করেন। প্রায় সেই কবচকেই "গোসানী কবচ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহা আড়ম্বরে "গোসানীদেবীর" স্থাপন করা হইল।

কান্তেশ্বরের নানা স্থানে গমন করিয়া কোটেশ্বর, সিদ্ধেশ্বরী, বিদেশ্বরী, বানেশ্বর, জল্পেশ্বর প্রভৃতি স্থানে মন্দির স্থাপন ও পূজার ব্যবস্থা ইত্যাদির সংবাদ পাই। রাজবাড়ীতে ফিরিবার পথে কান্তনাথ মন্ত্রী শশীপাত্রের বাড়ীতে গমন করিলেন। সেখানে স্নানাহার সারিয়া বিশ্রাম গ্রহণ কালে শশীপাত্রের পুত্র মনোহরকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া বনমালার নিকট মনোহরের রূপ বর্ণনা করায় বনমালা গুপ্তভাবে তাহার সাথে সাক্ষাতের আয়োজন করেন। সুড়ঙ্গপথে বনমালার সহিত মনোহরের প্রণয় যোগাযোগ সংবাদ রাজার কাছে পৌছিল। ক্রুদ্ধ রাজা তাহা ধরিবার জন্য দূত নিয়োগ করিলেন। একদিন দেখা গেল, মনোহর সাগরের জলে ডুব দিয়া প্রহর গত হইলেও উঠিল না। ইহাতে দূতদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। ভেক (ফাঁদ) পাতিয়া তাহাকে ধরিবার ব্যবস্থা হইল। শশীপাত্র রাত্রির দৈবী স্বপ্নে তাঁহার পুত্রের পরিণতির কথা অবগত হইলেন। তাহার পর যথারীতি ভেক পাতিয়া রাখায় ভেকমধ্যে ধরা পড়িয়া মনোহরের মৃত্যু হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বনমালাকে উহার মাংস রান্না করিতে আদেশ দিলেন। বনমালা নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। গভীর দুঃখে ক্রন্দনরতা রাণী মনোহরের মাংস রান্না করিলে রাজা অন্যান্য পাত্রমিত্রসহ শশীপাত্রকে লইয়া ভোজনে বসিলেন। ভোজনকালে শশীপাত্র পুত্রের অঙ্গুরী-সহ নখ দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং গোসানীর দৈববাণী যে ঠিক হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। পুত্রশোকে আকুল শশীপাত্র বলিতে লাগিলেন, পুত্র যদি অন্যায় করিয়া থাকে তবে তাহার শাস্ত্রমত বিচার হইবে, তাহাকে কেন উহার মাংস রান্না করিয়া আহার করান হইল? নানা চিন্তা করিয়া শশীপাত্র নিরুদ্দেশ হইলেন। রাজা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। শশীপাত্র গৌড়ের নবাবের কাছে গিয়া সমস্ত

ঘটনা বলিয়া বেহার রাজ্য আক্রমণ করিতে উৎসাহ দিলেন। দীর্ঘকাল মহাসমরের পর কান্তেশ্বর নবাবের হাতে বন্দী হইলেন। রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া বনমালাসহ পঞ্চরাণী যোগলে স্পর্শ করিবামাত্র পাষাণ হইয়া গেলেন। তাহার পর নবাবের গোসানীমন্দির প্রবেশ বিষয়ে নিষেধাত্মক দৈববাণী হওয়ায় শচীপাত্র মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন সিংহাসনে গোসানীদেবী নাই। কান্তেশ্বর রাজার কুলদেবতা কান্তেশ্বরী কাজলী কুড়ায় অন্তর্হিতা হইলেন। আর কান্তেশ্বরকে লোহার পিঞ্জরে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার পথে তিনি যখন পিতৃলোকের শেষ তর্পণ আশায় কাজলী কুড়ায় নামিলেন, তখন দেবী গোসানী আকাশবাণীতে জলমধ্যে তাহার অবস্থান জানাইলেন, রাজা জলে ডুব দিয়া দেবী গোসানীর কাছে চলিয়া গেলেন। জলের মধ্য হইতে আর না উঠাতে নবাব মনে করিলেন যে তাঁহাকে বোধ হয় কুমীরে খাইয়াছে। তাহার পর রাজার অবর্ত্তমানে দেশে অরাজকতা দেখা দিল। শেষে এখানেও আকাশবাণীতে জানা গেল যে শিবের ঔরসে জাত পুত্র বেহারের রাজা হইবে। যথারীতি তাহাই হওয়াতে আবার মহাসমারোহে গোসানীর পূজা হইল। দেবী গোসানীর বরে আবার রাজ্যে শান্তিময় পরিবেশ ফিরিয়া আসিল।"

ইহাই হইল গোসানীমঙ্গল কাব্যের মূল বিষয়-বস্তু। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গোসানীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনী কোচবিহারের বহু পুঁথির মধ্যে ছড়ান আছে। যেমন রিপুঞ্জয় দাস রচিত মহারাজ বংশাবলীর কাহিনীর সহিত গোসানীমঙ্গল কাব্যের প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে দুই-একটি স্থানে কাহিনীর পরিবেশনার কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ব্রাহ্মণ কান্তনাথের রাজলক্ষণ দর্শন করিয়া বাড়ী আসিলেন, তাহার পর স্বামী-স্ত্রীতে নানা যুক্তি করিয়া নানা রকম ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া কান্তকে ভোজনে তুষ্ট করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার মাতাও বাদ যান নাই। এই অংশে লোকচরিত্রের সুন্দর চিত্র পাই। এই কাহিনীটিও অন্যত্র দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, "কাজলী কুড়ায় যে বস্তু দেখিবা তাহাকে ধরিবা" এই রূপ আছে, বিশেষ কোন নাম বলিয়া দেওয়া হয় নাই। তিনি শুধু সর্পের লেজ ধরিয়াছিলেন। মকর বা কুমীরের কোন কথাই নাই। বিশ্বকর্ম্মা হনুমান কর্ত্তৃক গড় ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শচীপাত্রকে এখানে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। দক্ষিণ দিক নিবাসী ক্ষত্রিয় জাতীয়

কাশ্যপ গোত্রজ সচিব কর্ম্মে অভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বীরবর-বীরবতীর পূর্ব্ব জীবনবৃত্তান্ত এখানে বর্ণিত হইয়াছে। "গোসানী" নাম লেখা কবচ উদ্ধার হইল এই কথাও বলা হইয়াছে। রাজা ঐ কবচ উদ্ধার করিয়া কালিকাপুরাণ বিধিমতে পূজা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ব্যাঘ্রেশ্বরী নামে দেবী স্থাপনের উল্লেখ আছে যাহা অন্যত্র নাই। ইহা ছাড়াও প্রাসাদে কোন এক স্থানে প্রস্রাব চিহ্ন দর্শন করিয়া রাজা অবগত হইলেন যে প্রাসাদে পরপুরুষের আগমন হয়। মহারাজ বংশাবলীতে বর্ণিত এই সব তথ্যের সাথে বর্ত্তমান সম্পাদিত গ্রন্থের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। শচীপাত্রকে গৌড়েশ্বরের নিকট গমনের স্থলে মহারাজ বংশাবলীতে দিল্লীশ্বরের উল্লেখ আছে। কোন গ্রন্থে মোগল, কোন গ্রন্থে পাঠান বলিয়া বিবরণ দেওয়া আছে। তবে হোসেন শাহ পাঠান (হাবসী) ছিলেন। মহারাজ বংশাবলীর মতে বন্দী কান্তনাথকে লোহার পিঞ্জর মধ্যে লইয়া কিছুদূর গমন করিলে উহা অতিশয় ভার বোধ করিয়া যে ভূমিতে রাখা হইয়াছিল ঐ স্থানের নাম হইয়াছে পিঞ্জরাইর ঝাড়। রাজমাতা বনমালা প্রভৃতি পঞ্চরাণী সকলেই অপহৃতা হইয়াছে। আরও জানা যায়, যে-সময়ে পাঠান (মোগল?) রাজাকে মারিয়াছে ঐ সময় গোসানীর নিকট হইতে এক সর্প উত্থিত হইয়া মুখ ব্যাদানে কবচরূপা ভগবতীকে লইয়া কালীকুণ্ড মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। এই অংশের সহিত মূল গ্রন্থের বক্তব্যের কোন মিল নাই।

পূর্ব্ব-আলোচিত তথ্যগুলির মধ্য হইতে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, গোসানীমঙ্গল কাহিনীটি বিশেষ কোন একজন রাজার কাহিনী নয়। ইতিহাস এখানে লোককাহিনীর দরবারে স্থান করিয়া লইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে এই কাব্যকথার জন্ম হইলেও জনমনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই কাব্যখানির মধ্য হইতে সেই সময়ের সমাজচিত্র, ধর্ম্ম, সংস্কার, অলৌকিকতা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিতে পারা যায়। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখি—যেমন বিশেষ মানুষের মাধ্যমে দেব মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। কোথাও বা গ্রামের শিরোমণিই পূজা প্রচারের কেন্দ্রমণি। কোথাও বা স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের বা স্থানের বৈশ্য সম্প্রদায়ই পূজা প্রচারের বাহক হইয়াছে। অতি সাধারণ মানুষের কোন স্থান নাই। এখানেও তেমনি রাজ চরিত্রের মাধ্যমে দেবী নিজের প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন। স্বভাবকবি নিজের অজ্ঞাতে লোকপ্রচলিত

কাহিনী শ্রবণের পর প্রক্ষিপ্ত ঘটনার সম্প্রসারণে কল্লোলিনী ধারার সৃষ্টি করিয়াছেন। সুদীর্ঘ এই পালাগানে বর্ণিত কাহিনী একটি সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করিয়াছে। কোন কোন মঙ্গল কাব্যে মানবিক শক্তির সঙ্গে ঐশ্বরিক শক্তির সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষে কোথাও ঐশ্বরিক শক্তির পরাজয়, শেষ পর্য্যন্ত কোন মতে দেব-দেবীকে জয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং মানুষের ভক্তি জয়লাভ করিয়াছে। আলোচ্য মঙ্গল কাব্যখানির কাহিনী বিন্যাসে বিভিন্ন উপভাগও করা আছে। মঙ্গল কাব্যের এবং পুঁথির যে বৈশিষ্ট্য তাহাও এখানে আছে। মঙ্গলাচরণ, ধুয়া, রাজপ্রশস্তি ইত্যাদি বাদ যায় নাই। ছন্দের দিক দিয়া বলা যায় পয়ার এবং ত্রিপদী ব্যবহার করা হইয়াছে, তবে সব সময়েই ছন্দের কঠিন নিয়ম মানিয়া কবি চলেন নাই। বানান বিষয়েও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়. উত্তরবঙ্গে সাপের যে একটি বিশেষ মূল্য আছে তাহার প্রভাব হইতেও এই মঙ্গল কাব্যটি বাদ যায় নাই। মধ্যযুগীয় গীতিধর্মী আখ্যানমূলক মাতৃতান্ত্রিক ভাবধারার বাহক অলৌকিক শক্তির বিজয় ঘোষণাকারী এই গোসানীমঙ্গল কাব্য এই শক্তিশালী মঙ্গল কাব্যটি বাংলা মঙ্গল কাব্যের জগতে বিয়োগাত্মক কাহিনী হিসাবে আদৃত হবে। এই কাব্যখানিকে মঙ্গল কাব্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যে ভরপুর একখানি খাঁটি মঙ্গল কাব্য বলা যাইতে পারে। পূজা প্রচারের পর হইতে আজ অবধি নিয়মিত বা বিশেষ পূজায় মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। ধর্মবিশ্বাস মানুষকে সমস্ত বিতর্কের ঊর্দ্ধে রাখিয়া এখনও দেবদেবীর নামে যে ভাবে পল্লবিত হইয়াছে তাহার সনাতন ধারা গোসানীমঙ্গলেও বিদ্যমান। লৌকিক বৈদিক সংস্কৃত ধর্ম মতেই স্থানীয় মানুষের গভীর শ্রদ্ধা আছে। এই শ্রদ্ধাবোধই এখানকার লোকজীবনে অন্তর্মুখীনতার বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে "গোসানীমঙ্গল" পুঁথি পাওয়া যায়। কাহিনীর মূল ধারা ঠিক থাকিলেও লিপিকার বা স্থান কালের প্রভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন নানা পুঁথিতে পরিলক্ষিত হয়। সমালোচকের ভাষায় বলতে গেলে "সাতনকলে আসল খাস্তা"। আমি পুনঃ মুদ্রণের সময়ে কোচবিহার সাহিত্য সভায় সংরক্ষিত (অধুনা দুষ্প্রাপ্য) মুদ্রিত পুস্তকটি অপরিবর্ত্তিত রাখার চেষ্টা করিয়াছি। সঙ্গে শব্দার্থ, সংক্ষিপ্ত টীকা, মন্তব্য ইত্যাদি দিবার প্রয়াস মাঝেমধ্যে আছে। অন্য পুঁথির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করি

নাই। এই গ্রন্থ বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খৃঃ) কলিকাতা হইতে শ্রীব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিল মাত্র আট আনা (তৎকালে বাত্রিশ পয়সা, বর্তমানে পঞ্চাশ পয়সা)। বইয়ের আকার ১/১৬ ডবল ক্রাউন, পৃষ্ঠা ১১২। অদ্যাবধি অপর কোন সংস্করণ বাহির না হওয়ায় ইহার গুরুত্ব ও অভাব বিবেচনায় পুনঃ প্রকাশের এই প্রয়াস। মঙ্গলাচরণ অধ্যায়ে পরিষ্কার দেখা যায় এই গ্রন্থটি মূল ঐতিহাসিক কালের শুরু হইতে আনুমানিক তিনশত বৎসর পরে ভক্তকবি সাহিত্যপ্রাণ মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের (১৭৮৩-১৮৩৯) রাজত্বকালে রচিত। কবি রাধাকৃষ্ণ রাজার যশ প্রশস্তিও করিয়াছেন। কবির বংশ পরিচিতিতে দেখা যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু করুণাকর-পুত্র রাধাকৃষ্ণ দাস (অধিকারী)। ইহার অতিরিক্ত কিছু জানা যায় নাই।

এই গোসানীমঙ্গল হইতে আমরা তৎকালীন সমাজচিত্রের একটি পরিষ্কার রূপরেখা অঙ্কন করিতে পারি। এখানে প্রথমেই গর্ভবতী নারীর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে যাহা আমাদের পারিবারিক দৈনন্দিন ঘরোয়া কথায়। প্রথম মাসে কেহ কিছু জানিতে পারে না; দ্বিতীয় মাসে প্রতিবেশীজন কানাকানি করে; তৃতীয় মাসে গর্ভচিহ্ন দেখা যায়; চতুর্থ মাসে দেহ ভার হয়; পঞ্চম মাসে পারিবারিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়, পঞ্চগব্য ভক্ষণ করান হয়; ষষ্ঠ মাস হইতে নানাবস্তু খাওয়ার জন্য মন আনচান করে; পোড়ামাটী, সোজাত্রবা দধি অম্ল ঘোল-আদি খাইতে খুব ইচ্ছা হয়। নানা টক ফলাদি খাইতে ইচ্ছা হয়; অষ্টম মাসে আবার সামাজিক অনুষ্ঠান করিয়া কলা চিনি খাওয়ান হয়; তাহার পর নবম মাসে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শুধু আলস্য আর আলস্য। অঙ্গনার অন্তঃসত্বা অবস্থার কথা বলিতে আমাদের ঘরের প্রতিটি নারীর বর্ণনা দিয়াছেন। তারপর সর্প-স্বপ্ন দেখিবার কথাও আছে। দশম মাসে গঙ্গাজল খাওয়াইয়া মনশুদ্ধিকরণ বা পবিত্র থাকিবার রীতিও বর্ণিত হইয়াছে। পুত্র হওয়ার পর জাতকর্ম, সমস্ত নিয়ম নিষ্ঠা পালনের সাথে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন এবং নামকরণের কথাও কবি বাদ দেন নাই। কান্তনাথকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য শুভদিন দেখিয়া গুরুর কাছে পাঠান হইল। তাহার পর সেখানে সে বাংলা, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, কাব্য শাস্ত্রের সাথে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য তন্ত্র, মন্ত্র, রাজনৈতিক তত্ত্বও অধ্যয়ন করিল। পুত্রের বক্ষকটে গরীব মাতার আর্থিক দৈন্য-

অনিত আক্ষেপবাক্য এখানে শোনা যায়। পিতা ভক্তিশরের মৃত্যুতে মা ও ছেলের বিলাপ দৈনন্দিন আমাদের ঘরের কথাকে মনে করাইয়া দেয়। শ্রাদ্ধ শান্তি বিষয়ে ক্ষত্রিয় বিধানে পিণ্ডদানের কথা আছে। পরবর্তীতে মায়ের মৃত্যুতে সহজপ্রাপ্য আমকাঠ দ্বারা শব দাহ এবং ক্ষত্রিয় মতে পিণ্ডদান করা বিষয়ে বর্তমান দিনের কথা মনে করাইয়া দেয়। প্রাসাদ নির্মাণ বর্ণনাকালে শালখুঁটির ব্যবহার, বেতের "ছাটিনী" দিয়া ছন খড়ের ঘরের কথা আছে। বিবাহ রীতিতে এই অঞ্চলের প্রভাবের ছাপ আছে। বিশেষত গুয়াপান কাটা (নিরীক্ষণ করা) ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান এ বিষয়ে লক্ষণীয়। কবির ভাষায়—

দধি চিড়া গুড় চিনি গুয়া পান আর।
ভারীর স্কন্ধেতে যাছ দিল শত ভার॥

বিবাহে নিমন্ত্রণ পত্র লেখার ব্যবস্থার উল্লেখ এই কাব্যে পাই। ইহা দক্ষিণবঙ্গের প্রভাব বলিয়াই মনে হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢোল, কাশী, ভেউর ইত্যাদির প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা করিতেন। বাড়ীতে কাজের লোক রাখিয়া কাজ করাইয়া লইবার প্রথা চালু ছিল। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যে গোলন্দাজ থাকিত তাহাও জানিতে পারি। এই কাব্য হইতে তৎকালীন সমাজ জীবনের সাথে বর্তমানের তুলনা করিতে বারেবারেই লোভ হয় না কি? বনমালার পরপুরুষের প্রতি মোহ এবং তাহার পরিণতি বিষয়ে জানিতে পারি। জাতি ও ধর্ম বিষয়ে যে কঠিন সংস্কার ছিল তাহাও কবির চিন্তা হইতে বাদ যায় নাই। কাঞার (মাড়োয়ারী) দোকান করিবার তথ্যও এখানে পরিবেশিত হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে বোঝা যায় মাড়োয়ারীরা বেশ প্রাচীন কাল হইতেই এই অঞ্চলের ব্যবসার লাগাম ধরিয়া আছে। সমাজ জীবনে তাঁতীর কথাও বাদ যায় নাই। যম, চিত্রগুপ্ত বিষয়ে ভারতীয় ধারণার কথাও কবি উল্লেখ করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে তদানীন্তন সমাজ জীবনের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্খা, হাসি-ঠাট্টা, উৎসব-অনুষ্ঠান, নারীর প্রেমচিত্র, ভালবাসা, পুত্রস্নেহ, লোকচরিত্র, লোকজীবন ইত্যাদি বিষয়ের জীবন দর্পণ আমাদের মনকে দোলা দেয়। ভোরবেলা স্বপ্ন দেখিলে তাহার সত্যতা বিষয়ে যে একটি বিশ্বাস আছে তাহাও অঞ্জনার বিভিন্ন স্বপ্নের মাধ্যমে কবি আমাদের ঘরের চিরায়ত বিশ্বাসেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। স্বপ্নে দেবতা

বিভিন্নভাবে ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাকে সব সময়েই আগলাইয়া রাখিয়াছেন বলা যায়। অবোধ শিশুকে যেমন ভাবে মা প্রতিটি বিষয়ে সাহায্য বা উপদেশ দিয়া থাকেন এখানেও দেবী চণ্ডী অনুরূপভাবে পূজা প্রচারের মাধ্যমে ভক্ত কাঞ্চনাথের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন। দুর্গানটীর মাধ্যমে কবি এখানে বারবণিতার প্রচলন ও মর্য্যাদা বিষয়েও ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশের জনসাধারণের জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি যে সুগভীর বিশ্বাস প্রচলিত আছে তাহার প্রমাণ পাই এই কাব্যেও। জ্যোতিষী ডাকাইয়া শুভদিনের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করাইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইত। এখানেও কাঞ্চনাথ শিকারে যাইবার পূর্ব্বে শিকারযাত্রা শুভফলদায়ী হইবে কিনা তাহা জানিবার জন্য জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। অতঃপর জ্যোতিষীর বিধান মতে রাজা শিকার যাত্রা স্থগিত রাখিয়া কাজলী কুণ্ডায় মাছ ধরিতে যান।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জবা, ধাত্রী, বেল, সীতা, পদ্ম, কুসুম, অপরাজিতা প্রভৃতি ফুলের যে প্রচলন ছিল তাহাও আমরা এই কাহিনীর মাধ্যমে জানিতে পারি। তাহা ছাড়াও রাজনির্দ্দেশে নাগেশ্বর, কেতকী, জবা, অশোক, পলাশ, ইন্দ্রকমল, স্থলকমল, গন্ধরাজ, চম্পক, করবী, শ্বেতজবা, নীলজবা, কাঠমল্লিকা, বেলীফুল, আমলকি, সূর্য্যমুখী, বেল, শেফালিকা, গোলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে আনয়ন করিয়া এই অঞ্চলে রোপিত হইল

কবির রচনা গতানুগতিক হইলেও স্থানে স্থানে অলঙ্কার, বর্ণনা এবং উপমা ব্যবহারের সুন্দর পরিচয় পাই। কাঞ্চনাথের জন্ম হওয়ার পর আনন্দে বলিতে শোনা যায়— "আকাশের চাঁদ যেন হাতেতে পাইল।" কাঞ্চনাথের বিবাহের সময়ে—

বেদী পূর্ব্বভাগে পঞ্চকন্যা বসাইল।
চন্দ্রমা সহিতে যেন রোহিনী শোভিল॥

দুর্গানটী দর্শনে রাজা বলিতেছেন—

"হেন কালে কামিনী আইল একজন।
মরাল জিনিয়া তার মন্থর গমন॥
উর্ব্বশী মেনকা কিংবা রম্ভা তিলোত্তমা।
ইহার অঙ্গেতে কেহ না হয় উপমা॥"

বনমালার সহিত মানাহরের অবৈধ সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

"পাপকার্য্য পাপকথা ছাপা নাহি রয়।
বস্ত্র আচ্ছাদিলে অগ্নি আরো বৃদ্ধি হয়।"

তুলনামূলক আলোচনায় উপমা হিসাবে শচীপাত্রের কার্য্যকলাপের কথায় রামায়ণের বিভীষণের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়া কান্তনাথ নিজের পরিণতির কথাও অনুমান করিয়াছেন। এইভাবে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলিকে আরও ভালভাবে বুঝাইবার উপায় হিসাবে যে ভাবে উপমাগুলিকে কবি সঠিক স্থানে যথার্থভাবে কৃতিত্বের সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা এবং রচনাশৈলীর পরিচয় পাই।

উপমা ব্যবহারের সাথে সাথে কবি অনেক প্রবাদ এই কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। যে প্রবাদগুলি স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে বহন করে। যেমন "রাজার দণ্ড হেতু প্রজায় পায় ভাত"। অনুরূপ আরো বিভিন্ন ধরনের প্রবাদ বাক্য এই কাব্যে আছে।

ভাষা প্রসঙ্গে বলা যায় এই গোসানীমঙ্গল কাব্যখানি অতি প্রাচীন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা রচিত হইয়াছিল। সেই কারণে শব্দ ব্যবহার পরিমার্জিত, ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়াও পরিশোধিত, অলংকার, ছন্দ, উপমা ইত্যাদি সাবলীল। দুর্বোধ্য বা অপ্রচলিত শব্দ নাই বলিলেই চলে। প্রকাশিত গ্রন্থটি পাঠের সময় ভাষার সাবলীল ব্যবহারে প্রাচীন বলিয়া মনে করা অনেক সময়ই অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। এমন কি ইংরাজি শব্দ "ফায়ার"ও এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও "নফর" ইত্যাদি বিদেশী শব্দ স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কোচবিহার অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ গুয়াপান, পানীফল, কৃষাণ, শুকটা, পিদল, কাঞ্চা, শালখুঁটার পিড়িগাড়ি ইত্যাদি আঞ্চলিক ও কথ্যভাষার প্রয়োগ আছে। তবে সাহিত্যের ভাষাই এখানে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মত এখানেও দেবী নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার লাভের আশায় ভক্তকে নানাভাবে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখাইয়া বশ করিয়াছেন। এখানে অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মত ভক্তের সঙ্গে দেবতার সংগ্রাম নাই। শান্তরস এখানে প্রবাহমান। ভক্ত স্বাভাবিকভাবে জন্মলগ্ন হইতেই গোসানী চণ্ডীর দাস হইয়া আমাদের চোখে ধরা দিয়াছেন। দেবতার প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করার পথে সজ্ঘাত দেখা যায় নাই। নায়ক কান্তনাথ জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দৈবী আশীর্ব্বাদপুত ছিলেন এবং তাহার বিশ্বাস,

ভক্তি বা শ্রদ্ধার প্রতি কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মত এখানেও দেবতা তাহার পূজা প্রচার করিবার জন্য নানাভাবে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এখানে ভক্তের প্রতি আচরণ, চলন, বলন স্বাভাবিক। ভক্তের প্রতি স্নেহধারাই বিভিন্ন পরিবেশে বর্ষিত হইয়াছে। ভক্তকে রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা এই কাব্যে আছে। আধ্যাত্মিকতা লোকসমাজের মধ্যে বাসা বাঁধিলেও পরিণতিতেও দৈবী শক্তিই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই ভাবেই মহাশক্তিদায়িনী চণ্ডী বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রূপে লৌকিক, বৈদিক, স্থানীয় নাম গ্রহণ করিয়া নিজের পূজা বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চণ্ডী অনেক সময়ে অতি প্রাকৃত রূপ অথবা মোহিনী রূপ ধারণ করিয়া ভক্তের মন জয় করিয়াছেন। কামাখ্যা মাহাত্ম্যকেও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে কবি নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়া করুণ ও বীররসের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। বিয়োগাত্মক লোকায়ত এই কাহিনীতে রাজচরিত্রের পৌরুষ ও বীরত্ব কথা প্রকাশের চেষ্টা বিশেষ নাই। দীর্ঘকাল যুদ্ধের উল্লেখ থাকিলেও রাজার ভূমিকা কি ছিল তাহার প্রকাশ নাই। রাজা সাধারণ ঘরের ছেলের মত চলাফেরা করিয়াছেন। তাঁহার শৌর্যবীর্য প্রকাশের কোন অবকাশ এখানে নাই। শিব-পত্নী চণ্ডী মর্ত্যে লীলা প্রচারের আশায় আসিয়া উগ্রমূর্তি ধারণ করেন নাই। দেবীর কৃপাদৃষ্টি ভক্তকে সব সময়েই রক্ষা করিয়াছে। দেবী চণ্ডীর মহিমা বর্ণনায় বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশের সঙ্গে কালকেতু উপাখ্যানও কবি এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কোচবিহারের সাহিত্যসাধনায় সোনালী ফসল এই "গোসানীমঙ্গল" বাংলা সাহিত্যের প্রবাহে অনেক মঙ্গল কাব্যের অন্যতম। কিন্তু এই কাব্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। এই কাব্যের শিরায় শিরায় কোচবিহারের ভৌগোলিক, আঞ্চলিক মানুষের রীতিনীতি ও ভাব-চেতনায় প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হইয়াছে এবং এক পৃথক সত্তা অভিন্ন মহিমা দান করিয়াছে এই কাব্যকে।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় অনেকের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার কথা বারবার স্মরণ করিতে হয়। তবে বিশেষ করিয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ (অধুনা রবীন্দ্র

অধ্যাপক, বিশ্বভারতী) শ্রদ্ধেয় ডঃ ভবতোষ দত্তের স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া কাজ করিতে পারায় আমি ধন্য। তিনি নানা ব্যস্ততার মধ্যেও আমার বক্তব্যগুলি পাঠ করিয়া স্থান কাল উপযোগী উপদেশদানে সংস্করণটির প্রকাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তাহার পর আমার গবেষণা নির্দেশক দার্জিলিং গভঃ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় দূরে থাকিয়াও পত্র মারফত বিভিন্ন উপদেশ দানে বাধিত করিয়াছেন এবং অভিমত পাঠাইয়া সম্পাদিত গ্রন্থটির স্বীকৃতি দানে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু দে-র সাদর সান্নিধ্যে মতামতকে সাবলীল করার সব সময়েই প্রেরণা পাইয়াছি। সর্ব্বদা পাশে থাকিয়া অনেক অচিন্তিতপূর্ব্ব দুরূহ সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিয়াছেন বন্ধুবর মৃণালকান্তি দাম। তাঁহার অকৃপণ সহযোগিতা আমার জীবনপথে আশার আলো স্বরূপ। কোচবিহার জেলার বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীনিখিলকুমার মানীর সাহিত্য-অনুরাগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতে হয়। তিনি আমাকে জেলার সাহিত্য কর্ম্মের উপযুক্ত বিন্যাস ও রূপদানে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকরণে পরিশ্রম লাঘব করিয়া দিয়াছেন সাপ্তাহিক "পৌণ্ড্রদর্পণ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় তরুণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রতনকুমার ভট্টাচার্য্য। প্রকাশনা বিষয়ে ভৌগোলিক দূরত্ব লাঘবের চেষ্টা করিয়াছেন কবি-সমালোচক বার্ণিক রায়। প্রকাশক শ্রীবিজদাস করের অকৃত্রিম প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থের শীঘ্র প্রকাশ সম্ভব হইল। প্রচ্ছদ অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন সুসাহিত্যিক, অভিনেতা-নাট্যকার নীরজ বিশ্বাস। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।

সম্পাদনাকালে বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। অনবধানতাজনিত কিছু ত্রুটী ঘটিয়া থাকিলে তাহার দায় সম্পূর্ণই আমার।

পরিশেষে, আমার অক্ষমতায় বোধ হয় অনেক কথাই বলা হইল না, তবে আশা রাখি, চিন্তাশীল পাঠকবর্গ সেগুলির সংযোজন ও সংশোধনের পরামর্শদানে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পূরণের সুযোগ করিয়া দিবেন।

মূল গ্রন্থ

গোসানী-মঙ্গল।

অর্থাৎ

রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক

জীবন বৃত্তান্ত।

—:*:—

৺রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত।

—:*:—

কলিকাতা আলবার্ট কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ

৺কৃষ্ণবিহারী সেন এম, এ, মহোদয়ের

অনুমত্যানুসারে

গোসানীমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক

শ্রীব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৬ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩০৩

মূল্য ।০ আট আনা

বিজ্ঞাপন।

"গোসানীমঙ্গল" কোচবিহারের আদি কাব্য। কবি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী ইহার প্রণেতা। ইহাতে রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত লিখিত আছে। যাঁহারা কান্তেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দর্শন বাসনায় এখানে (গোসানীমারিতে) আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই উক্ত কাব্য দেখিবার জন্য বাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই হস্তলিখিত বই নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ও বিরল বিধায় প্রায় সকলকেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। কয়েক বৎসর হইল মহারাজা বাহাদুরের খুল্লতাত শ্বশুর কলিকাতা আলবার্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রিন্সিপাল পরম শ্রদ্ধাস্পদ মৃত কৃষ্ণবিহারী সেন এম, এ, মহোদয় এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উপরোক্ত অভাব দেখিয়া আমাকে উক্ত পুস্তক সঙ্কলন ও প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং কোচবিহার ষ্টেট হইতে মুদ্রাঙ্কনব্যয় দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে উক্ত মহোদয় হঠাৎ কালকবলে পতিত হওয়ায় রাজসরকার হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হই, এবং নিজেও মুদ্রাঙ্কনব্যয় সঙ্কুলানে অক্ষম বিধায় ঐ কার্য্য এতদিন সম্পন্ন করিতে পারি নাই। এইক্ষণ আমার পরমবন্ধু গদাইখোড়া মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দত্ত ও আমবাড়ী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু শশিমোহন অধিকারী মহোদয়গণের সাহায্যে এই পুস্তক জনসাধারণে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র গুপ্ত এম, এ, ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন রায় মজুমদার এম, এ, মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করিয়া মুদ্রাঙ্কন করিবার বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন এবং এইস্থান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বাউলচন্দ্র দাস পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

এখানে আমার প্রায় দশ বৎসর যাবৎ অবস্থান হেতু সকল পৌরাণিক কীর্ত্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও এ হেন ইতিহাস পাঠে এবং লোকমুখে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহার সমস্ত বিবরণ পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টে বিবৃত করিলাম। এইজন্য ইহা সর্ব্বসাধারণজনগণের নিকট আদৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। অলমিতি।

প্রকাশক

সন ১৩০৫ সাল ১২ই পৌষ	শ্রীব্রজচন্দ্র মজুমদার, হেড্‌পণ্ডিত, গোসানীমারি স্কুল, কোচবিহার।

গোসানী-মঙ্গল

মঙ্গলাচরণ

নম গুরু নিরঞ্জন, পিতা মাতার শ্রীচরণ,
যাঁর তেজে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
নম দেব গণপতি, দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী,
হরি হর ব্রহ্মা নারায়ণ॥
হরেন্দ্র নারা(য়)ণ রাজা, বেহারে পালেন প্রজা,
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন।
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর[1]
পরম বৈষ্ণব গুণধাম॥
তাহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্য ভেক[2]
চিন্তে হরি-চরণ-কমল।
তাহে আদেশিলা দেবী, কহে রাধাকৃষ্ণ কবি,
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল॥
অবনী লোটায়ে কায়, বন্দে গোসানীর পায়,
আদেশ পাইয়া মনে ভয়।
যেরূপে গোসানী নাম, কান্তেশ্বরী অনুপম,
ব্যক্ত হইল আপন ইচ্ছায়॥
কান্তেশ্বরে করি রাজা, তাহার লইল পূজা,
বর দিয়া করিলা অমর।
চণ্ডী যার পৃষ্ঠোপর, জিনে রাজা দেবাসুর,
বাহু বলে শাসিল বেহার॥
নম চণ্ডী ভগবতী, দেবতা করিলে স্তুতি,
কালীরূপে নিশুম্ভ বধিলা।
দেবী ঘোর যুদ্ধ করি, মহিষাসুর বধ করি,
দেবগণে উদ্ধার করিলা॥

---

১ করুণাকর—গ্রন্থ প্রণেতা ৺রাধাকৃষ্ণের পিতা।

২ চৈতন্য ভেক—চৈতন্যদেব প্রচারিত সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন।

ভজ চণ্ডী কর পূজা, চণ্ডী বরে হয় রাজা,
হেলা না করিও চণ্ডী পূজা।
ইন্দ্র করি চণ্ডী পূজা, অমর হইল রাজা,
রামচন্দ্র কৈল চণ্ডী পূজা ॥
কদম্বমূলে ব্যাধ কৈয়া, মৃগ মারে বনে গিয়া,
সেই ব্যাধ কৈল চণ্ডী পূজা।
কালকেতু নাম তার, পাইয়া চণ্ডীর বর,
গুজরাটে হ'ল মহারাজা ॥
চন্দ্র-বংশে কৈল পূজা, ভগদত্ত মহারাজা,
কামরূপেশ্বর মহাবীর।
পাইয়া চণ্ডীর বর, এক রথে বীরবর,
দিগ্বিজয় করে নিরন্তর ॥
কুরুক্ষেত্রে করে রণ, যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন,
সংসারের যত রাজাগণ।
দুর্য্যোধন দুরাচারে, বরে ভগদত্ত বীরে,
ভগদত্ত কৈল ঘোর রণ ॥
ভগদত্তার্জ্জুনে রণ, পৃথিবী না সহে টান,
ভগদত্তে অর্জ্জুনে কাটিল।
বেহারে নাহিক রাজা, ব্যাকুল হইল প্রজা,
অরাজক কত কাল ছিল ॥
হইল আকাশ বাণী, পূজা কর মা ভবানী,
পুনঃ হবে রাজ্যের ঈশ্বর।
গোসানী করহ পূজা, সুখে রবে যত প্রজা,
রাজা হবে নাম কান্তেশ্বর ॥
শুনিয়া আকাশ বাণী, পূজা করে মা ভবানী,
বিল্বপত্র দিয়া ফল ফুল।
পূজা পা'য়া বর দিল, ভবানী কৈলাসে গেল,
ভণে কবি গোসানী-মঙ্গল ॥

পয়ার

বেহারে দক্ষিণগ্রাম নাম জামবাড়ী[1]।
সেই গ্রামে জাম বৃক্ষ আছে সারি সারি ॥
সুবর্ণ বরণ জাম ফলে বার মাস।
শ্রীফল[2] বেলাদি তথা চির পরবাস ॥
পার্ব্বতী সহিত শিব শ্রীফলের তলে।
একত্র বসিয়া কথা কহে নানা ছলে ॥
শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন।
এই রাজ্যে যত লোক সুখী সর্ব্বজন ॥
সুবর্ণ বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে।
ঘরে ঘরে শিবদুর্গা পূজে কুতূহলে ॥
চণ্ডী কহে বর দেও ভোলা মহেশ্বর।
এই রাজ্যে রাজা হ'ক নাম কান্তেশ্বর ॥
পার্ব্বতীর বাক্যে বর দিলা মহেশ্বর।
প্রভাতে উঠিয়া গেল কৈলাস-শিখর ॥
জামবাড়ী গ্রামে ছিল নাম ভক্তীশ্বর।
অঙ্গনা তাহার নারী পরম সুন্দর ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান রহে সদাচারে।
কায়মনোবাক্যে সদা পূজে মহেশ্বরে ॥
পতিব্রতা নারী সেই পতিভক্তি করে।
সতত পতির মন তোষে সদাচারে ॥
এক দিন স্বামীসঙ্গে হাস্য রসে আছে।
শাস্ত্র প্রমাণাদি কথা তার স্থানে পুছে ॥
তন্ত্র মন্ত্র শুনে আর বেদ রামায়ণ।
কথার প্রসঙ্গে উঠে চণ্ডীর পূজন ॥
স্বামীমুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য।
চণ্ডী পূজিবার তরে করিল মনস্থ ॥

---

১ ভিতর কামতা। গোসানীমারী মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। মন্দির হইতে প্রায় এক-চতুর্থাংশ কি.মি. দূরে অবস্থিত গ্রাম। অদ্যাবধি বহু জামগাছ ওখানে বিদ্যমান।

২ বেল।

এমন সময়ে দেখ হ'ল দৈব বাণী।
মোর পূজা কর ধনি! হবে যশস্বিনী॥
আকাশ বাণীতে শুনি এতেক বচন।
চণ্ডী পূজিবার তরে কৈল দৃঢ় মন॥
স্বামী প্রতি কহে সতী শুন প্রাণেশ্বর।
চণ্ডী পূজিবার দ্রব্য আনহ সত্বর॥
তক্ষীশ্বর কহে প্রিয়ে! আমি মহা দুখী।
জগতের মাতা দয়া মোরে করিবে কি?
সতী কহে শুন কান্ত আমার এ বাণী।
ভক্তিতেই বশ হন জগত জননী॥
রামায়ণ কথা প্রভু করহ স্মরণ।
বালিতে পূজিল দেবী শ্রীরঘুনন্দন॥
করহ চণ্ডীর পূজা দিয়া ফল মূল।
ইহাতে চণ্ডীকা যদি হন অনুকূল॥
এইরূপে কথাবার্ত্তা বলিতে দু'জন।
অস্তাচলে মগ্ন দেখ হইল তপন॥
দীপ জ্বালি ধূপ দিয়া শঙ্খ বাজাইল।
মঙ্গল আরতী ক'রে গৃহ-কার্য্যে গেল॥
রজনীতে ভোজনাদি করি সমাপন।
দম্পতি যুগল সুখে করিলা শয়ন॥
মহা সুখে উভয়েতে শু'য়ে নিদ্রা যায়।
শিয়রে বসিয়া চণ্ডী স্বপন দেখায়॥

অঙ্গনার স্বপ্ন দর্শন

শুন শুন তক্ষীশ্বর শুনহ অঙ্গনা।
তোমাদের হ'তে প্রিয় নাহি কোন জনা॥
করহ আমার পূজা লহ ইষ্টবর।
তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
সত্য করি কহি, ব্যর্থ না হবে বচন।
মম বরে তব পুত্র হইবে রাজন॥

রাখিবা পুত্রের তুমি কাঞ্চনাথ নাম।
এ কথা কহিয়া চণ্ডী হ'ল অন্তর্দ্ধান॥
স্বপন দেখিয়া জাগি উঠে ভক্তীশ্বর।
ধীরে ধীরে কহে কথা অঙ্গনা গোচর॥
স্বপনে শুনিনু মুই চণ্ডীর বচন।
মম পুত্র কাঞ্চনাথ হইবে রাজন॥
অঙ্গনা কহিল নাথ এ কথা নিশ্চয়।
শিয়রে বসিয়া চণ্ডী মোর কর্ণে কয়॥

ভক্তীশ্বর ও অঙ্গনার চণ্ডী পূজা

প্রাতঃকৃত্য করি দোঁহে জামবাড়ী গেলা।
চণ্ডী পূজিবার তরে সকলে ডাকিলা॥
জবা ফুল, ধাত্রী ফুল[১], বেল ফুল, গীতা[২]।
পদ্মকুসুম তোলে আর অপরাজিতা॥
সহকার পত্র ঘটে করিয়া স্থাপন।
সিন্দুরের ফোটা দিল অতি সুশোভন॥
পদ্মপত্র, বিল্বপত্র আর হরিতকী।
তণ্ডুল কদলী দুর্ব্বা আর আমলকী॥
আম জাম শ্রীফলাদি কত উপচার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি আনিলা অপার॥
ধূপ দীপ মধুপর্ক অগুরু চন্দন।
ইত্যাদি অনেক দ্রব্য কৈলা আয়োজন॥
গলায় বসন বান্ধি স্তবন করিলা।
ভক্তিবশ হৈয়া দেবী ঘটে দেখা দিলা॥
অঙ্গনা কহিছে মাগো শুন নিবেদন।
তোমার কৃপায় যেন পাইগো নন্দন॥
সুপ্রসন্ন হ'য়ে মোরে দেহ এই বর।
মম গর্ভে জন্মে যেন তনয় সুন্দর॥

---

১ ধুতুরা ফুল।
২ গীতা ফুল—আতা ফুল।

জগৎ জননী মাগো জগৎ পালিনী।
দুঃখ বিমোচন কর চণ্ডীকা ভবানী॥
সিংহ-বাহিনী মাগো বিমলা কাত্যায়নী।
মহানন্দা ভবানন্দা ভবের ভবানী॥
ভদ্রকালী বক্তৃদন্তা ভবের ভবানী।
শ্রীদুর্গা ঈশ্বরী তুমি নৃমুণ্ডধারিণী॥
হেনমতে ভক্তীশ্বর করেন স্তবন।
তুষ্ট হ'য়ে ভগবতী দিলা দরশন॥
আকাশ বাণীতে দেবী দিলেন উত্তর।
পাইনু তোমার পূজা শুন ভক্তীশ্বর॥
ধন পুত্র বর আমি দিলাম তোমারে।
ধন পুত্র লৈয়া সুখে রহত সংসারে॥
বর দিয়া চণ্ডী গেল কৈলাস-ভবন।
তথায় অঞ্জনা কৈল পূজা সমাপন॥

কান্তেশ্বরের জন্ম

কত দিনে অঞ্জনা হইলা ঋতুমতী।
পদ্মারে ডাকিয়া চণ্ডী কহিলা ভারতী॥
শুন শুন পদ্মা মা কুমারী বিবরি।
কান্তনাথ রাজা হবে গ্রাম জামবাড়ী॥
কোচ রাজ্য মধ্যে কান্তা সুপবিত্র স্থান।
আমিও তথায় গিয়া হব অধিষ্ঠান॥
কান্তনাথ হ'তে হবে পূজার প্রচার।
মনে মনে এই যুক্তি করিয়াছি সার॥
চন্দ্রনাথ কামাখ্যাদি যত পীঠস্থান।
তাহার সমান ইহা কভু নহে আন॥
কান্তনাথ প্রিয় ভক্ত মম দ্বারী ছিল।
শাপেতে হইয়া ভ্রষ্ট ভূমিতলে গেল॥
কিছুকাল রাজ্য ভোগি আসিবে কৈলাস।
এইত বৃত্তান্ত তার জানিবে নির্যাস॥

এতেক শুনিয়া পদ্মা করিল গমন।
অঞ্জনার গর্ভে কাম্বে করিল স্থাপন॥
শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া বৃহস্পতি বারে।
কান্তনাথ প্রবেশিলা অঞ্জনা-উদরে॥
এক মাস গর্ভ হ'ল কিছুই না জানি।
দ্বিতীয় মাসেতে সবে করে কাণাকাণি॥
তিন মাসে গর্ভ-চিহ্ন হইল উদয়।
মনে ভাবে চণ্ডী বুঝি হইল সদয়॥
চতুর্থ মাসেতে তার দেহ হ'ল ভার।
চলিতে সামর্থ্য নাহি আলস্য অপার॥
পঞ্চ মাসে পঞ্চগব্য করিল ভক্ষণ।
ষষ্ঠ মাসে নানা বস্তু খেতে গেল মন॥
পোড়া মাটী সোন্ধা[১] দ্রব্য খায় অনুক্ষণ।
দধি, অম্ল, ঘোল আদি খাইতে যতন॥
হইল সপ্তম মাসে শরীর দুর্ব্বল।
দাড়িম্ব কেশুর খায় আর পানিফল[২]॥
অষ্ট মাসে কলা চিনি খাইতে মনন
ভক্তীশ্বর এনে দেয় করিয়া যতন॥
নবম মাসেতে ধনী অতীব দুর্ব্বল।
মাটিতে শুইতে বাঞ্ছা হইল কেবল।
দিন-রাত্রি ভেদ নাই আলস্যে শয়ন।
ঘুমেতে সুন্দরী দেখে অদ্ভুত স্বপন।
চতুর্দ্দিকে ফণা ধ'রে থাকে সর্পগণ।
নিদ্রা ভঙ্গে সুন্দরী পাইয়া চেতন॥
সর্প নাহি কিবা ভ্রম ভাবে মনে মন।
এখনি দেখিনু ফণী নাহিক এখন॥
এইরূপে নয় মাস পরিপূর্ণ হ'ল।
দশম মাসেতে নারী গঙ্গা জল খা'ল॥

---

১ সোঁদা—সুগন্ধি দ্রব্য।
২ সিঙ্গাড়া—জলজ কণ্টকী ফল বিশেষ।

গঙ্গাজল খেয়ে ধনী পবিত্র হইল।
শুভদিনে শুভক্ষণে পুত্র প্রসবিল।
রূপেতে করিল আলো সূতিকার ঘর।
কন্দর্প জিনিয়া পুত্র অতি মনোহর॥
পুত্রলাভে অঙ্গনার আনন্দ হইল।
আকাশের চাঁদ যেন হাতেতে পাইল॥
জাত কর্ম্ম আদি যত সকলি করিল।
চূড়াকর্ণ করি তবে মুখে ভাত দিল॥
চণ্ডীর আদেশ ছিল কান্তেশ্বর প্রতি।
কান্তনাথ নামে পুত্র হইবেক খ্যাতি॥
সেই মতে নাম তার রাখে কান্তনাথ।
সাবধান হ'য়ে সবে শুনহ পশ্চাৎ॥

বিদ্যাশিক্ষা ও অলঙ্কার লাভ

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইল যখন।
শুভ দিন দেখি করে বিদ্যা আরম্ভন॥
অল্পকাল গুরু স্থানে করি অধ্যয়ন।
বাঙ্গালা সংস্কৃত শিখে করিয়া যতন॥
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত।
তন্ত্র-মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত॥
পণ্ডিত দেখিয়া পুত্রে কহে ভক্তীশ্বর।
শুনহ অঙ্গনা সতী আমার উত্তর॥
গরীবের ঘরে চণ্ডী পুত্র দান দিল।
বস্ত্র অলঙ্কার দিতে কিছু না মিলিল॥
কান্তনাথ রাজা হবে চণ্ডীর কৃপায়।
এ বড় দুঃখের কথা বস্ত্র নাহি পায়॥
আক্ষেপিয়া ভক্তীশ্বর নিশ্বাস ছাড়িল।
কৈলাসে থাকিয়া তাহা চণ্ডীকা জানিল॥

ভক্তীশ্বর মনোবাঞ্ছা পূরিবার তরে।
প্রভাতে যোগিনীগণ গেল তার ঘরে॥
প্রবেশ করিয়া দূতী ভক্তীশ্বর ঘর।
ছল করি কথা কহে অঙ্গনা গোচর॥
এই গ্রামে বাস করি সব নারীগণ।
আশীর্ব্বাদ করি যাব তোমার নন্দন॥
অতি সুলক্ষণ শিশু কন্দর্পের প্রায়।
নারীরূপে যোগিনী অলঙ্কার পরায়॥
হস্তেতে বলয় দিল পদেতে নূপুর।
কটিতে কিঙ্কিনী দিল গলে মতিহার॥
এইরূপে সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া সজ্জিত।
মাথাতে টোপর দিল দেখিতে অদ্ভুত॥
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া আশীর্ব্বাদ দিল।
নিমিষে যোগিনীগণ অন্তর্দ্ধান হ'ল॥

ভক্তীশ্বরের স্বর্গে গমন

এইরূপে পঞ্চবর্ষ হ'ল সমাপন।
দৈব বশে বিধি পাকে ঘটে বিড়ম্বন॥
যম কহে চিত্রগুপ্ত করহ বিচার।
ভক্তীশ্বর পরমায়ু কত আছে আর॥
পাপ-পুণ্য আদি তার করহ নির্ণয়।
কোন্ স্থানে বাস তার উপযুক্ত হয়॥
চিত্রগুপ্ত কহে তবে সকল বৃত্তান্ত।
ভক্তীশ্বর সম সাধু নাহিক কৃতান্ত॥
চতুর্দ্দশী পালে দেখ আর দুর্গাষ্টমী।
শিবরাত্রি পালে আর জয়ন্তী অষ্টমী॥
শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী পাইয়া।
উপবাসে জাগরণে পূজে পুষ্প দিয়া॥

একাদশী ব্রত আদি যত তিথি পায়।
ব্রত উপবাসে পূজে হরগৌরী পায় ॥
পুণ্যবান তক্ষীশ্বর আয়ু নাহি তার।
আজি তক্ষীশ্বরে দিব তোমার গোচর ॥
বিচিত্র বিধির লীলা বুঝে উঠা ভার।
কার ভাগ্যে কিবা ঘটে কে বলিবে তার ॥
ভোজন করিয়া সুখে আছে তক্ষীশ্বর।
হেন কালে আচম্বিতে হ'ল তার জ্বর ॥
ওঝা আনি তন্ত্র-মন্ত্র অনেক করিল।
মস্তকে তরণ[1] দিয়া পাতি[2] বসাইল ॥
কেহ বলে দৃষ্টি রোগ কেহ বা বাস্থলী[3]।
এই রূপে নানা ওঝা নানা রূপ বলি ॥
কিছুই নির্ণয় কেহ করিতে নারিল।
তিন দিনে তক্ষীশ্বর জীবন ত্যজিল ॥
শিবদুর্গা বলি প্রাণ বাহির হইল।
শিবদূতে ধরি তারে শিব-লোকে নিল ॥
পুণ্যবানবলি তারে পুণ্যস্থানে দিল।
মন সুখে তক্ষীশ্বর স্বর্গপুর গেল ॥
স্বামীর কারণ কান্দে অঞ্জনা সুন্দরী।
হায় বিধি বলি কান্দে ভূমিতলে পড়ি ॥
মায় পোয়ে গলাগলি কান্দে হুমাহুমি।
কেন বিধি বিড়ম্বিলা না মরিনু আমি ॥
অসার সংসার মাঝে জীবন চঞ্চল।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল ॥

---

১ নানা প্রকার লতা-পাতা বাটিয়া অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরিভাগে দিয়া থাকে। যদি মস্তকের উত্তাপে ঔষধ শুষ্ক হইয়া যায় তাহা হইলে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। ইহাকেই তরণ কহে।

২ ঔষধে উপকার না হইলে ওঝারা রোগীকে অপদেবতা আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া নানারূপে তাহার পূজা করিয়া থাকে। ইহাকেই পাতি কহে।

৩ সান্নিপাত রোগ।

অঞ্জনার বিলাপ

কান্দেন অঞ্জনা সতী, হারাইয়া প্রাণপতি,
এই মোর কপালে লিখন।
পাইয়া চণ্ডীর বর, হ'ল পুত্র গুণধর ;
বিধি তাহে কৈল বিড়ম্বন ॥
মনে যত আশা ছিল, কিছু তাহা না পুরিল ;
হরি মোরে করিলা দুর্দ্দশা।
হরি হয় নারায়ণ, সেবিলাম শ্রীচরণ ;
কত সাধে কত ছিল আশা ॥
স্বপ্নে কহে নারায়ণী, শুনহ অঞ্জনা ধনি !
পূজা কর দিব ধনবর।
করহ আমার পূজা, তোর পুত্র হবে রাজা ;
বর দিনু হইবে অমর ॥
পূজিনু চণ্ডিকা পায়, পাইনু শ্রীকান্ত রায় ;
বিধি মোরে বিধবা করিলা।
এ দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণ কায় ;
সব আশা নৈরাশ হইল ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে, পড়িয়া বিষম ফাঁদে ;
কান্দে সতী দিয়ে মাথে হাত।
পড়িয়া ধরণীতলে, মুখে হরি হরি বলে ;
আর্ত্তনাদে কান্দে কান্তনাথ ॥
জ্ঞাতিবর্গ ডাকাইয়া, করিল অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ;
পিণ্ড দিল ক্ষত্রিয় বিধানে।
পিণ্ড পে'য়ে ভক্তীশ্বর, বিষ্ণুপুরে কৈল ঘর ;
সযতনে রাধকৃষ্ণ ভণে ॥

অঞ্জনা কহেন এই ললাট লিখন।
অদৃষ্টের দুঃখ কভু না যায় খণ্ডন ॥
কান্তনাথ বলে মাতা না কর ক্রন্দন।
সকলি করিতে পারে দেব নারায়ণ ॥

অঞ্জনা কহেন বাপু চণ্ডীকার বরে।
তুমি পুত্র রাজা হবে কামতা নগরে॥
রাজা না হইলে বাপু ব্যর্থ হ'ল বর।
ম'রে গেল তব পিতা নাম ভক্তীশ্বর॥
এমন বিষম দুঃখ না যায় সহন।
কি মতে হইবে বাপু ভরণ পোষণ॥

কান্তনাথের দাসত্ব

এইরূপ বিলাপেতে রাত্রি অবসান।
মায়ে পোয়ে হেসে কেঁদে হ'ল ম্রিয়মাণ॥
প্রভাতে আইল তথা এক দ্বিজবর।
আশীষিয়া কহে কথা অঞ্জনা গোচর॥
শুনহ অঞ্জনা সতী ব্রাহ্মণের কথা।
প্রভাতে ব্রাহ্মণ বাক্য না কর অন্যথা॥
প্রণমি অঞ্জনা সতী দিলেন উত্তর।
কি হেতু আইলে হেথা কহ দ্বিজবর॥
দ্বিজ কহে শুন কহি আমার বচন।
বিধবা হ'য়েছ তুমি কে করে পোষণ॥
কান্তনাথ চাহি আমি তোমার ছা(ও)য়াল।
মম গৃহে হইবেক গরুর রাখাল॥
অন্নবস্ত্রে প্রতিপোষ[১] করিব তোমারে।
কোন দুঃখ না পাইবা আমার গোচরে॥
অঞ্জনা কহেন দ্বিজ উত্তম কহিলে।
ভয় করি দিতে কিন্তু দুধের ছাওয়ালে॥
জিজ্ঞাসা করিব আগে পুত্রের গোচর।
গাভী চরাইতে কিনা পারে কান্তেশ্বর॥
এত শুনি কান্তনাথ দিলেন উত্তর।
চরাইব গাভী মাতা নাহি কোন ডর॥

১ প্রতিপোষণ—সমর্থন বা সহায়তা (পালন) করা।

ইহা শুনি অঙ্গনার আনন্দ হইল।
ব্রাহ্মণের হাতে কান্তনাথে সমর্পিল॥
এইরূপে কান্তনাথ ব্রাহ্মণের ঘরে।
গাভী চরাইয়া ফিরে বনের ভিতরে॥
দিনে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করে সমাধান।
সন্ধ্যাকালে মাতৃগৃহে করয় প্রয়াণ॥
এইরূপে কান্তনাথ গাভীগণ সনে।
কৌতুক করিয়া ফিরে বন উপবনে॥
বন হ'তে গাভীগণ হইয়া বাহির।
বৃক্ষের ছায়াতে যেয়ে হয় সে সুস্থির॥
বৃক্ষের নিকট আছে এক সরোবর।
ধেনু বৎস জল তথা খাইছে বিস্তর॥
সুস্থ হ'য়ে গাভীগণ ইতস্ততঃ যায়।
সুশীতল স্থান পেয়ে কান্ত নিদ্রা যায়॥
বৃক্ষতলে কান্তনাথ শুয়ে নিদ্রা গেল।
কৈলাসে থাকিয়া তাহা ভবানী জানিল॥
চণ্ডী কহে শুন পদ্মা কর অবধান।
শীঘ্রগতি দেও নাগ কান্তনাথ স্থান॥
বৃক্ষতলে কান্তনাথ শুয়ে নিদ্রা যায়।
রবির কিরণ দেখ পড়ে তার গায়॥
এত শুনি পদ্মা দুই নাগ পাঠাইল।
মস্তক উপরে সর্প ফণা ধরি রৈল॥
নিদ্রাগত কান্তনাথ নাহিক চেতন।
চারিদিকে গাভীগণ করিছে ভ্রমণ॥

দাসত্ব মোচন

এইরূপে প্রতিদিন ছেড়ে গাভীগণ।
বৃক্ষতলে মহাসুখে করয় শয়ন॥
গাভীগণ যথাতথা করিয়া বিহার।
কৃষকের শস্য ক্ষতি করিছে অপার॥

সকল কৃষক আসি ব্রাহ্মণে কহিল।
তোমার গাভীতে সব শস্য বিনাশিল॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ অতি ক্রোধমতি।
কান্তনাথে শাস্তি দিতে করিল যুকতি॥
বৈশাখ মাসের রৌদ্র অতি খরতর।
যষ্টি হস্তে দ্বিজবর হ'লে অগ্রসর॥
অপূর্ব্ব ঈশ্বর-লীলা কি বলিব আর।
চণ্ডী যারে রক্ষে সদা কিবা ভয় তার॥
মহাসুখে কান্তনাথ শুয়ে নিদ্রা যায়।
পত্র ভেদি সূর্য্যরশ্মি পড়ে তার গায়॥
দেখিয়া সে দ্বিজবর হইল বিস্ময়।
ভয়ঙ্কর বিষধর ফণা ধরি রয়॥
মস্তকে ধরিছে ফণা আকাশে করি ভর।
রবি-কর ঢেকে আছে দেখি লাগে ডর॥
কান্তনাথ প'ড়ে আছে ভূমির উপর।
অগ্নিকণা জ্বলে যেন মস্তক উপর॥
অধিক আশ্চর্য্য আর করে বিলোকন।
হস্তে পদে চক্র-চিহ্ন রাজার লক্ষণ॥
এতেক দেখিয়া বিপ্রে ভয় উপজিল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করিতে নারিল॥
মনে মনে ভাবে বিপ্র কি করি উপায়।
কান্তনাথে খায় নাগে না দেখি উপায়॥
এইরূপে দ্বিজবর আছে বহুক্ষণ।
অস্তাচলে যায় তবে হইল তপন॥
দেখহ দেবীর মায়া আশ্চর্য্য কথন।
শিবদুর্গা বলি কান্ত পাইল চেতন॥
জাগিয়া উঠিল কান্ত নাগ পলাইল।
দেখিয়া বিপ্রের মনে বিস্ময় হইল॥
চমৎকৃত হ'য়ে বিপ্র গেল নিজ ঘর।
হেথা কান্ত মনে মনে হইল কাঁপর॥

কালনিদ্রা হ'ল মোর গাভী গেল কোথা।
ধান খাইবার বুঝি গেল যথা তথা॥
গাভী হারাইয়া কান্ত করিছে রোদন।
গাভীর কারণে মোরে মারিবে ব্রাহ্মণ॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল ব্রাহ্মণের ঘরে।
ধেয়ে আসি বিপ্রবর কান্তনাথে ধরে॥
না কান্দ না কান্দ বাপু শুনহ বচন।
আপনি আসিছে ঘরে যতেক গোধন॥
এত শুনি কান্তনাথ সুস্থির হইল।
বিপ্রের চরণ ধরি প্রণাম করিল॥
ঘরে আসি কান্তনাথ জননীর পাশ।
গাভী হারা যত কথা কহিল প্রকাশ॥
শুনিয়া অঙ্গনা হ'ল চিন্তাকুল মন।
শিরে ঘ্রাণ ল'য়ে কৈল আশীস বচন॥
মনেতে ভাবিয়া বামা শ্রীদুর্গা স্মরিল।
নারায়ণ চিন্তা করি রাত্রি পোহাইল॥
রাত্রি অবসানে বিপ্র আইল প্রভাতে।
ধীরে ধীরে কহে কথা অঙ্গনা সাক্ষাতে॥
শুনহ অঙ্গনা সতী আমার বচন।
কান্তনাথে গোচারণে নাহি প্রয়োজন।
যাবৎ থাকিবা তুমি অভাগার ঘরে।
অন্ন বস্ত্রে প্রতিপোষ করিব তোমারে॥
কিন্তু এক কথা মম আছে তব পাশ
সত্যে বদ্ধ হ'লে তাহা করিব প্রকাশ।
কান্তনাথ হয় দেখ তোমার নন্দন।
তাহা হ'তে হবে মোর কার্য্যের সাধন॥
এত শুনি কান্তনাথ বলে ধীরে ধীরে।
যা বলিতে হয় প্রভু বলহ আমারে॥
যাবৎ কণ্ঠেতে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবৎ তোমার কার্য্য না করিব আন॥

সত্য সত্য এই সত্য করিলাম সার ।
সত্য না পালিলে হবে নরক অপার ॥
এতেক শুনিয়া তবে বলে দ্বিজবর ।
তুমি যদি কদাচিৎ হও নৃপবর ॥
মম স্থানে মন্ত্র তুমি করিবা গ্রহণ ।
রাজগুরু বলি যেন ঘোষে সর্ব্বজন ॥
কান্তনাথ বলে গুরু করিব তোমারে ।
এ রাজ্যের রাজা যদি হই তব বরে ॥
প্রণমিল কান্তনাথ দ্বিজ দিল বর ।
ব্রাহ্মণের ঘরে কান্ত আছে পূর্ব্বাপর ॥
বিপ্র কহে কান্তনাথ ছাড় গোচারণ ।
ঘরে বসি পাইবা তুমি বস্ত্র আভরণ ॥
এত শুনি কান্তনাথ প্রণাম করিল ।
সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিজ প্রস্থান করিল ॥

কান্তনাথের স্বপ্ন দর্শন

রজনীতে মায় পোয়ে করিলা শয়ন ।
কহিছে অঞ্জনা যত পূর্ব্ব বিবরণ ॥
মাতার বচন আর ব্রাহ্মণ কাহিনী ।
মনে মনে করি চিন্তা যাপিল রজনী ॥
যামিনী প্রভাত হয় এমন সময় ।
শিয়রে বসিয়া চণ্ডী স্বপন দেখায় ॥
শুন শুন কান্তনাথ না ভাবিবা দুঃখ ।
অবশ্য হইবে রাজা পাবে নানা সুখ ॥
প্রভাতে উঠিয়া কর উত্তরে গমন ।
কাজিলী কূড়ায়[১] কর স্নান সমাপন ॥

---

১ জলাশয় । বর্তমানে বিশিঙ্গা । মন্দির হইতে চার মাইল (প্রায় ৬·৪ কি. মি.) দূরে বরলা নদীতটে ।

স্নান করি পূর্ব্ব মুখে জলেতে দেখিবা।
ভয়ঙ্কর তিন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবা॥
ভয় না করিবে তুমি তাহাকে দেখিয়া।
অবশ্য ধরিবে তুমি আমাকে ভাবিয়া॥
জলমধ্যে উঠিবে মকর ভয়ঙ্কর।
তাহাকে ধরিবা তুমি নাহি কোন ডর॥
মকর ধরিলে বংশ রবে চিরকাল।
কুম্ভীর দেখিবে পরে দুই চক্ষু লাল॥
তাহাকে ধরিবা তুমি নাহি কোন ভয়।
মম বাক্য কদাচিৎ ব্যর্থ নাহি হয়॥
ভয়ে যদি মকরাণী ধরিতে না পার।
আমাকে স্মরণ করি কুম্ভিরিণী ধর॥
কুম্ভীর ধরিলে বংশ বাড়িবে অপার।
দেখিবে তাহার পর সর্প ভয়ঙ্কর॥
নাগিনী ধরিলে তুমি নির্ব্বংশ হইবা।
এই তিন রূপে কথা নিশ্চয় জানিবা॥
স্বপন কহিয়া চণ্ডী কৈলাসেতে গেল।
চৈতন্য পাইয়া কান্ত জাগিয়া উঠিল॥
জননীর স্থানে সব বৃত্তান্ত কহিল।
চণ্ডী সহ যে সমস্ত কথন হইল॥
মাতৃ আজ্ঞা ল'য়ে কান্ত করিল গমন।
কাজিলী কুড়ায় যেয়ে দিল দরশন॥
স্নান করি পূর্ব্ব মুখে দেখিবার পায়।
প্রকাণ্ড মকর মূর্ত্তি ভাসিয়া বেড়ায়॥
ভয়েতে তাহার কাছে যাইতে নারিল।
ঈষৎ হাসিয়া মূর্ত্তি জলেতে ডুবিল॥
মকর হইল যদি জলেতে মগন।
কুম্ভিরিণী বেশে দেবী দিলা দরশন॥
গভীর গর্জ্জন করি ভাসিয়া উঠিল।
কান্তনাথ ভয়ে তারে ছুঁইতে নারিল॥

মকর কুম্ভীর যদি হ'ল অন্তর্দ্ধান।
নাগিনী রূপেতে দেবী হ'ল অধিষ্ঠান॥
জলে কুণ্ডলী করি আকাশে ধরে ফণা।
মস্তকে জ্বলিছে যেন আগুনের কণা॥
মুখ হ'তে অনর্গল অনল পড়িছে।
ভয় পেয়ে কান্তনাথ ধরিতে নারিছে॥
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় প্রবল।
কান্তনাথ ভাবে পাছে হারাই জীবন॥
কান্তনাথ মনোরথ বুঝি মহামায়া।
জলেতে লুকান তিনি আপনার কায়া॥
জলে তল হয় সর্প দেখে কান্তনাথ।
স্মরণ করিয়া সার ধরিল পিছাং[১]॥
হাসিয়া কহিলা দুর্গা সর্পরূপ ছাড়ি।
বংশ নাশ কৈলা কান্ত কেন ভ্রম করি॥
মকর কুম্ভীর ছাড়ি ধর সর্পবর।
এক পুরুষের তরে হবে দণ্ডধর॥
মুখ বক্ষঃ না ধরিলা ধর লেজ শেষ।
অল্প কাল রাজ্য ভোগি দুঃখ পাবে শেষ॥
দশভুজা রূপে চণ্ডী দিলা দরশন।
নমস্কার করি কান্ত বন্দিলা চরণ॥
চণ্ডী কহে শুন কান্ত না কর সংশয়।
প্রভাতে পাইবা রাজ্য জানিবা নিশ্চয়॥

———

দেবীর প্রতি কান্তেশ্বরের স্তুতি

চণ্ডীর শুনিয়া বাণী, কান্তনাথ যোড়পাণি,
শুন মাতা ভবের ভবানী।
তুমি যাহা মনে কর, কার সাধ্য বোধে তার,
মায়াময়ী জগৎ মোহিনী॥

---

১ পিছা—পশ্চাৎভাগ। স্থানীয় ভাষায় সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ।

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পদ, পূজিয়া তোমার পদ,
শুন মাতা জগৎ তারিণী।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত, তোমার কটাক্ষে নত,
হরি হর ব্রহ্মার জননী॥
দেখায়ে অপার মায়া, দিয়া তুমি পদ ছায়া,
কেন ছাড় দুখের ছাওয়ালে।
সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধি দাতা, তুমি বট জগন্মাতা;
কিবা দোষে মোরে ছাড়াইলে॥

আমি কি জানিব মাতা তোমার বৃত্তান্ত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁর নাহি পায় অন্ত॥
উৎপত্তি প্রলয় তুমি কটাক্ষেতে কর।
ভোলানাথ ম্রিয়মাণ ভেবে নিরন্তর॥
অনাদ্যা অপরা তুমি জগতের গতি।
আমি কি বলিব মাতা তোমার ভারতী॥
এতেক শুনিয়া কান্তের সকরুণ বাণী।
আকাশে থাকিয়া তারে কহেন ভবানী॥
শুন কান্ত এই মম স্বরূপ বচন।
অবিচারে রাজ্য তুমি না কর পালন॥
যত্তপি আমার বাক্য অন্যথা করিবে।
আপনার দোষে তুমি আপনি মজিবে॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া চণ্ডী হ'ল অন্তর্দ্ধান।
ধীরে ধীরে কান্তনাথ গৃহে চলি যান॥

রাজপুরী নির্ম্মাণ

গৃহেতে আসিয়া কান্ত জননীর পাশ।
আদি অন্ত সব কথা করিল প্রকাশ॥
কৈলাসে থাকিয়া চণ্ডী বিশাই[১] স্মরিল।
স্মরণ মাত্রেতে বিশাই দরশন দিল॥

১ বিশ্বকর্ম্মা—স্বর্গের (দেবতাদের) স্থপতি।

কি আজ্ঞা বলিয়া বিশাই প্রণাম করিল।
হাতে পান দিয়া তবে ভবানী কহিল॥
আমার পরম ভক্ত হয় কান্তেশ্বর।
কামতা নগরে সেই হবে দণ্ডধর॥
তথা গিয়া রাজপুরী করহ নির্ম্মাণ।
জগতে ঘুষিবে যশ শুন মতিমান॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হ'ল আনন্দিত।
কর্ম্মিগণ সহ যেয়ে হয় উপনীত॥
কোদাল ধরিয়া তবে যত শিল্পগণ।
দশ দণ্ডে বান্ধে গড় অতি সুশোভন॥
আকাশ পরশে গড় অতি উচ্চতর।
তার নীচে করে খাদ দেখিতে সুন্দর॥
পরিখাবিশিষ্ট গড় হইল অভেদ্য।
ভিতরে প্রবেশ করে কার হেন সাধ্য॥
অতি উচ্চ হ'ল গড় মনে মনে ভাবে।
দ্বার না হইলে লোকে কেমনে যাইবে॥
ইহা বলি শিল্পগণে পাঠান পর্ব্বতে।
বাছিয়া পাথর তারা আনিল ত্বরিতে॥
পূর্ব্বেতে শ্রীবৎস রাজা ছিলেন বেহারে।
কলি ছাড়ি তপ করি গেল স্বর্গপুরে॥
বেহারে হইল রাজা ভগদত্ত বীর।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করি ছাড়িল শরীর॥
বেহার অরাজক হ'য়ে কত কাল ছিল।
তার যত দালান কোঠা ভাঙ্গিয়া আনিল॥
পূর্ব্বদিকে কাটে গড় প্রথম দুয়ার।
ধর্ম্মদ্বার বলি নাম রাখেন তাহার॥
দ্বারের উপরি রাখি ধর্ম্মের মূরতী।
ধর্ম্মদ্বার বলি লোক করিবেক খ্যাতি॥
এই মতে পূর্ব্ব দ্বার করিল নির্ম্মাণ।
উত্তরের গড় লাগি করিল প্রয়াণ॥

কাটিল উত্তর দ্বার পরম সুন্দর।
ইষ্টক প্রস্তরে তাহা কৈল মনোহর॥
লোহার কপাট দিল অতি চমৎকার।
অক্ষয় দুয়ার বলি নাম হৈল তার॥
পশ্চিমের গড় লাগি করিল গমন।
কাটিল পশ্চিম গড় অতি সুশোভন॥
লোহার কপাট আনি লাগাইয়া দিল।
জয় দ্বার বলি নাম সর্ব্বত্র ঘুষিল॥
আনন্দে চলিয়া গেল দক্ষিণ দিকেতে।
করিব উত্তম দ্বার ভাবিয়া মনেতে॥
ইষ্টক প্রস্তরে বান্ধি নির্ম্মাণ করিল।
লোহার কপাট আনি তাহে লাগাইল॥
অতি অনুপম হ'ল দক্ষিণের দ্বার।
শিলস্তম্ভ দিয়া রাখে নাম শিল দ্বার॥
চারি দিকে চারি দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া।
চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্ম্মা দেখে নিরখিয়া॥
নির্ম্মাণ হইল গড় দেখিল নয়নে।
শিষ্য সঙ্গে বাহিরিল বাহির প্রাঙ্গণে॥
বিশ্ব কহে শিষ্য সব শুনহ বচন।
গড়ের দক্ষিণে গড় করহ পত্তন॥
আজ্ঞা পা'য়া কর্ম্মিগণ গড় বানাইল।
গড়ের মধ্যেতে গড় যত্নে বানাইল॥
শাল খুটার পিড়িগাড়ি লোহার খিল দিল।
বেতের ছাটিনী দিয়া বাঙ্গালা[১] বান্ধিলা॥
খেড়ি ঘর বার গোটা করিল নির্ম্মাণ।
নানা চিত্র করে তাহে অতি সুশোভন॥
দেখিলে সুন্দর পুরী মনে এই হয়।
যমের ভুবন কিম্বা ইন্দ্রের আলয়॥

---

১ ধনুরাকৃতি চুয়াযুক্ত খড়ে-ছাওয়া দোচালা ঘর। কোন কোন স্থলে চারচালা বা আটচালা ঘরকেও বাঙলা (Bungalow) বলে।

রঞ্জিত করিয়া পুরী কাছারী বসা'ল।
যার বাঙ্গালা বলি তার আখ্যান হইল ॥
তাহার নিকট এক কৈল সরোবর।
সাগরদীঘি[১] নাম তার ঘোষে নিরন্তর ॥
তথা হ'তে কর্ম্মিগণ করিল প্রস্থান;
উত্তরে করিল পুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ ॥
রাজার বিলাস-ক্ষেত্র অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
কুবের অলকা বলি মনে হয় জ্ঞা'ন ॥
এখানে করিবে রাজা সর্ব্বদা বিশ্রাম।
শীতল আবাস বলি রাখে তার নাম ॥
তথা হ'তে কর্ম্মিগণ বাহির হইয়া।
চণ্ডী পুজিবার মঠ গড়িল যাইয়া ॥
পূর্ব্বদিকে হ'ল মঠ অতি মনোহর।
লোহার কপাট দিল মধ্যেতে পাথর ॥
নানাবিধ মণিমুক্তায় সাজন করিল।
দীপ্ত হুতাশন যেন জ্বলিতে লাগিল ॥
চারি দিকে ছোট দেয়াল করিল নির্ম্মা'ণ।
দালানের চারি দিকে দ্বার চারি খান ॥
পশ্চিমের দ্বারে দিল বালাখানা করি।
নহবত বসাইল তাহার উপরি ॥
এরূপে চণ্ডীর মঠ করিয়া নির্ম্মাণ।
পশ্চিমের দ্বার লাগি করিল প্রস্থা'ন ॥
মনোহরদীঘি[২] এক তথায় কাটিয়া।
চারি ধার বান্ধে তার ইট পাথর দিয়া ॥
চারি ধারে চারি ঘাট পাথরে শোভিল।
মহেশের পাট তথা নির্ম্মাণ করিল ॥
অপূর্ব্ব হইল পাট দেখিতে সুন্দর।
কামেশ্বর পূজে তথা উমা মহেশ্বর ॥

---

১ এই দীঘি এইক্ষণ শিলোতী নদীর গর্ভশায়ী হইয়াছে।

২ এই দীঘির পূর্ব্ব পার্শ্বে সি ড়ি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে।

ভোলানাথ কয় দয়া দেব উমাপতি।
ভোলানাথের দীঘি বলি লোকে হইল খ্যাতি॥
হইল অপূর্ব্ব পুরী মহেশের পাট।
বড়ই মুস্কিল হ'ল নাহি তথা বাট॥
ইহা দেখি বিশ্ব তবে মনেতে করিল।
গড় কাটি মধ্যস্থানে দুয়ার গড়িল॥
করিল দুয়ার দেখ অতি পরিপাটী।
সদা যাহে বিরাজিত আপনি ধূর্জ্জটি॥
প্রস্তর নির্ম্মিত বাঘ দ্বারে বসাইল।
বাঘদুয়ার বলি নাম তাহার রাখিল॥
তথায় করি আর যত দেব স্থান।
পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি করিল নির্ম্মাণ॥
নাগকন্যা-মূর্ত্তি[1] দেখ অপূর্ব্ব গঠন।
সর্পের হইল দেহ মনুষ্যবদন॥
সুবচনী গড়িল হাতে দিল বালা।
কর্ণে কুণ্ডল দিল গলে বনমালা॥
মূষিকবাহনে গড়ে দেব গণপতি।
দশ মহাবিদ্যা গড়ে দেবী সরস্বতী॥
শঙ্কর সহিত আর শঙ্করী শোভিল।
বাসুদেব কামদেব অনেক গড়িল॥
নানাবিধ কারুকার্য্যে করিল শোভন।
মহেশের পাট হ'ল অমর ভুবন॥
হরগৌরী পাট যদি হ'ল সমাপন।
বান্ধিতে রাজার পাট করে আয়োজন॥
মাটিতে বান্ধিল ঢিপী[2] অতি উচ্চতর।
ইষ্টক প্রস্তরে বান্ধি কৈল মনোহর॥
তাহার উপরে কোঠা করিল নির্ম্মাণ।
মরকত স্তম্ভ কত শোভে স্থানে স্থান॥

---

১ এই মূর্ত্তি আদাবাড়ী গ্রামস্থিত হরিবোলার হাটে অক্ষুন্নভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

২ ঢিপী—মৃত্তিকার স্তূপ।

অতি উচ্চ হ'ল পাট জল নাহি তথা।
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা ভাবিছে সর্ব্বথা॥
মনেতে বিচারি তবে কূপ[১] কাটি দিল।
পাতাল হইতে গঙ্গা আপনি উঠিল॥
হেন মতে পাট যদি হ'ল সমাপন।
সিংহাসন লাগি বিশাই ভাবে মনে মন॥
রৌপোতে রচিল তবে সিংহ চতুষ্টয়।
মাণিকের চক্ষু তাহে অতি জ্যোতির্ম্ময়॥
তাহার উপরে দেখ আসন সুন্দর।
নাগেতে ধরিছে ফণা কিবা মনোহর॥
রজত নির্ম্মিত নাগ মুখ স্বর্ণকান্তি।
যাহা দেখি যবনের মনে হ'ল ভ্রান্তি॥
নাগিনী ধরিয়া রাজা হয় কামেশ্বর।
সে কারণে সিংহাসনে দিল অহিবর॥
হেন মতে রাজপাট করি সমাপন।
তাহার পশ্চাতে করে অন্দর ভবন॥
তাহার পূর্ব্বেতে দেখ টাকশাল হয়।
পাথরের স্তম্ভ তাহে অতি শোভাময়॥
তাহার পূর্ব্বেতে এক বুরুজ করিল।
নটীর বুরুজ বলি লোকে খ্যাত হ'ল॥
এইরূপে রাজপুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
গড়ের বাহিরে এক রচিল উদ্যান॥
পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে খুঁড়িল সরোবর।
সোয়ারী খেলিবে রাজা তাহার উপর॥
দীর্ঘে প্রস্থে অর্দ্ধ ক্রোশ হ'ল সরোবর।
দুই দিকে সক তার মধ্যেতে প্রসার॥
নৌকাতে চড়িয়া তাহে হবে জল খেলা।
সে হেতু তাহার নাম রাখিল পেটেলা॥
হইল মাটির কাজ যদি সমাপন।
কোদাল থুইল তবে সব কর্ম্মিগণ॥

১ রাজপাটের উপর একটি ইন্দারার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

কোদালের চোটে মাটি করিয়া অন্তর।
কোদালধোয়া[1] দীঘি কৈল অতি মনোহর॥
এইরূপে রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়া।
অস্ত্র শস্ত্র আদি যত দিল গড়াইয়া॥
তীরধনু গড়িল বন্দুক কামান।
কালু খাঁ ফতে খাঁ হ'ল তোপের প্রধান॥
গোলাগুলি বারুদাদি অনেক গড়িল।
বাহুল্য কারণ তাহা লিখা নাহি গেল॥
রাত্রি মধ্যে সব কর্ম্ম করি সমাপন।
বিশ্বকর্ম্মা চলি গেল আপন ভুবন॥

কান্তেশ্বরের রাজ্য প্রাপ্তি

রাত্রির মধ্যেতে হ'ল পুরীর গঠন।
শেষ প্রহরেতে চণ্ডী কহিলা স্বপন॥
শুন বাপু কান্তেশ্বর আমার উত্তর।
প্রভাতে হইবা তুমি রাজ্যের ঈশ্বর॥
কান্তনাথ নাম তোর, হ'লে রাজ্যেশ্বর।
আজি হ'তে নাম তোর হ'ল কান্তেশ্বর॥
মনোহারী আদি আর যতেক পশারী।
তেলী মালী মুচী ডোম আর যত হাড়ী॥
কুমার কামার তাঁতী যত জাতি ছিল।
নিশাতে সকলে চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইল॥
স্বপনে দেখায় চণ্ডী বিবিধ আকারে।
চলহ সকল লোক কামতা নগরে॥
তথা হ'তে ব্রাহ্মণের স্থানে চণ্ডী গিয়া।
দেখান স্বপন তাদের শিয়রে বসিয়া॥

---

১ মন্দির হইতে আনুমানিক ১'৫ কি. মি. দূরে অবস্থিত। কান্তেশ্বরের প্রাসাদ ও প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রাচীর, দীঘি তৈয়ারী করিবার পর কোদাল ধোয়া এবং স্নানাদি করিবার জন্য এই দীঘি খনন করা হয়। অদ্যাবধিও বর্ত্তমান।

বেহারে হইল রাজা নাম কান্তেশ্বর।
তথায় সকল দ্বিজ চলহ সত্বর॥
সর্ব্বস্থানে এই মতে কহিয়া স্বপন।
কৈলাস ভুবনে চণ্ডী করিলা গমন॥
নিশীথ সময়ে সবে স্বপন দেখিল।
ত্বরা করি সব লোক জাগিয়া উঠিল॥
একজন কহে তবে আর জন প্রতি।
কান্তনাথ হবে রাজা বেহারের পতি॥
অরাজক ছিল রাজ্য রাজা নাহি ছিল।
রাজার নামেতে সবে আনন্দ পাইল॥

ত্রিপদী

প্রভাত হইল নিশি, আলোকে পূরিল দিশি,
জাগিয়া উঠিল কান্তেশ্বর।
অঞ্জনা জাগিলা পরে শ্রীহরি স্মরণ ক'রে,
ডাকি কহে শুন পুত্রবর॥
চণ্ডীকা প্রসন্ন হ'ল, আজি দুঃখ দূরে গেল,
দেখ পুরী অপূর্ব্ব গঠন।
স্বপনে কহিল মোরে, শুন ধন! বলি তোরে,
পূজা কর চণ্ডীর চরণ॥
পূজা করি হও রাজা, পালহ সকল প্রজা,
বস গিয়া পাটের উপর।
কান্তেশ্বর বলে মাতা, উত্তম কহিলা কথা,
চণ্ডী মোরে দিয়াছেন বর॥
নানা পুষ্প আয়োজনে, পূজে চণ্ডীর চরণে,
মায়ে পুত্রে করেন স্তবন।
সুখদা বরদা তুমি, মূঢ়মতি হই আমি,
জ্ঞানহীন অতি অভাজন॥

কি বলি করিব স্তুতি, আমি মূঢ় হীনমতি,
এত বলি করিলা প্রণাম।
এমন সময় তথা, পূর্ব্ব প্রভু ব্রাহ্মণ তথা,
উপনীত স্বর্গ তার ধাম॥
গুরুদেব করি সঙ্গে, কান্তেশ্বর মনোরঙ্গে,
পাটোপরি করে আরোহণ।
কার্ত্তিকের শুক্ল দিনে, চণ্ডীকার উপাসনে,
অভিষেক করে বিপ্রগণ॥
শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়ায়, তারা চন্দ্র শুদ্ধতায়,
প্রতি বর্ষে তাহে উপাসনা।
কদলী পতাকা গড়ি, নানা বাদ্য শব্দ করি;
কার্ত্তিকের চন্দ্রে উপাসনা॥
নারীদের হুলুধ্বনি, ভাটদের স্তুতি বাণী,
কান্তেশ্বর পাটেতে বসিল।
অঙ্গনা সন্তুষ্ট অতি, পুরে প্রবেশিল সতী;
আজি মোর বাঞ্ছা সিদ্ধ হ'ল।
করহ চণ্ডীর পূজা, সুখে রবে রাজা-প্রজা;
রমাদেবী হবে না চঞ্চল॥

তিন দণ্ড বেলা মধ্যে কান্তেশ্বর রাজা।
রাজ্যের সমস্ত লোক করে তার পূজা॥
কৈলাসে থাকিয়া চণ্ডী করিলা হুঙ্কার।
সৈন্য সেনা ঘোড়া হাতী হইল অপার॥
অশ্বশালে বান্ধা গেল হাজার তুরঙ্গ।
মাহুত সহিতে আর যতেক মাতঙ্গ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইছে যত অস্ত্র আদি।
চণ্ডীর বরেতে এবে অসংখ্য বস্ত্রাদি॥
নানা দেশ হ'তে সব লোকজন আইল।
শাঁকারী[1] কাঁসারী কাঞ্চা দোকান খুলিল॥

---

১ শাঁখারী।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী কত অতিথি হইল।
ধর্ম্মশালা ঘরে সবে বাসা করি রৈল॥
দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জ আইল অপার।
সবারে তুষিল রাজা করি সদাচার॥
হেন মতে কান্তেশ্বর রাজ্যেশ্বর হ'ল।
আপন গৃহেতে শশী জাগিয়া উঠিল॥
শ্রীদুর্গা বলিয়া শশী ভাবে মনে মন।
পাত্র যে হইব চণ্ডী কহিলা স্বপন॥
আমবাড়ী নগরে হ'ল রাজা কান্তেশ্বর।
তাহার হইব মন্ত্রী চণ্ডী দিল বর॥
স্নান করি শশীবর করিল গমন।
রাজার সদনে যেয়ে দিল দরশন॥
বিপ্রে প্রণমিয়া শশী রাজাকে বন্দিল।
কোথা হ'তে এলে তুমি রাজা জিজ্ঞাসিল॥
শশী কহে নিবেদন শুন রাজ্যেশ্বর।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ধর্ম্ম কলেবর॥
পাটের উত্তরে ঘর হয় যে আমার।
শশীবর নাম মম এই জান সার॥
চণ্ডীর আদেশে এনু তোমার সদন।
মন্ত্রীপদ দেহ মোরে এই নিবেদন॥
শুনি রাজা কান্তেশ্বর আনন্দিত হ'ল।
তখনি শশীরে নিজ দেওয়ান করিল॥
শশীবর হ'ল মন্ত্রী সকলে জানিল।
সর্ব্বত্র তাহার যশঃ ঘুষিতে লাগিল॥
রাজা কহে শুন পাত্র আমার বচন।
চণ্ডীর কৃপায় আমি হইনু রাজন॥
তুমিও চণ্ডীর বরে হ'লে পাত্রবর।
চণ্ডী পূজি দোঁহে মাগি লই ইষ্টবর॥
আজ্ঞা পেয়ে শশীপাত্র আনন্দিত মন।
লোকজন সঙ্গে করি আনে আয়োজন॥

আতপ কদলী চিনি আনিল শ্রীফল।
আম জাম নারিকেল আর বিল্বদল॥
জবা কুসুম আনে আর অপরাজিতা।
যাহাতে দুর্গার মন হয় হরষিতা॥
শতদল পদ্ম আনে করিয়া যতন।
ধান্য দুর্ব্বা দিয়া পূজা কৈল আরম্ভন॥
দধি দুগ্ধ পরমান্নে করে সরোবর।
ধনের নাহিক অন্ত এবে দণ্ডধর॥
চণ্ডী পূজিবার তরে মঠ হ'য়েছিল।
সেই মঠে আয়োজন সকল করিল॥
স্নান করি রাজগুরু শুক্র দ্বিজবরে।
কুশাসনে বসি দ্বিজ চণ্ডী পূজা করে॥
চণ্ডীর মণ্ডপে রাজা আসি শীঘ্রগতি।
গলায় বসন দিয়া করে নানা স্তুতি॥
ছাগাদি মহিষ কাটি করিল পূজন।
হোম মহোৎসবে পূজা করে সমাপন॥
চারি দিকে নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।
মহারবে কর্ণ যেন বধির হইল॥
প্রসাদ নির্ম্মাল্য আনি দিল দ্বিজবরে।
ধারণ করিল রাজা মস্তক উপরে॥
ধর্ম্মশালা মধ্যে ছিল সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
ভোজন দক্ষিণা দিয়া তুষিলেন মন॥
ঘরে যেয়ে মাতৃপদে প্রণাম করিল।
যজ্ঞ অবশেষে রাজা ভোজন করিল॥
চণ্ডী বরে কান্তেশ্বর হয় রাজ্যেশ্বর।
পঞ্চ দিন পরে মাতা গেল যম ঘর॥
হাহা রবে কান্তনাথ করিছে ক্রন্দন।
রাজপদ দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন॥
করি আমি ভবানীর চরণ-ভরসা।
বিধির বিপাকে মোর হইল দুর্দ্দশা॥

আম কাষ্ঠ আনি রাজা শব দাহ করে।
পিণ্ড দান করিলেন ক্ষত্র ব্যবহারে ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা আদেশ করিল।
যতেক বাণিয়া ছিল ধরিয়া আনিল ॥
প্রণাম করিল সবে গলে বস্ত্র দিয়া।
কি আদেশ কর রাজা স্থির নহে হিয়া ॥

মোহর

মম নাম খুদি কর মোহর তৈয়ার।
কান্তেশ্বরী মোহর বলি হইবে প্রচার ॥
আজ্ঞা পেয়ে কর্ম্মিগণ ছাড়িল দোকান।
তৈয়ার করিল সব বিবিধ প্রমাণ ॥
এইরূপে কান্তেশ্বরী মোহর হইল।
পাটরাণী নাহি রাজা ভাবিতে লাগিল ॥
রাজা ভাবে চণ্ডীকার চরণ যুগল।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল ॥

কান্তেশ্বরের বিবাহ

দ্বিতীয় প্রহর নিশি রাজা নিদ্রা যায়।
শিয়রে বসিয়া চণ্ডী স্বপন দেখায় ॥
শুন শুন কান্তেশ্বর বচন আমার।
শক কন্যা বিবাহ যে হইবে তোমার ॥
আদেশ করিয়া চণ্ডী কৈলাসেতে গেল।
নিদ্রা ভঙ্গে কান্তেশ্বর ভাবিতে লাগিল ॥
বসিলেন গিয়া রাজা বাহির প্রাঙ্গণে।
হেনকালে গঙ্গাভাট গেল সেই স্থানে ॥
ভাট দেখে কান্তেশ্বর প্রণাম করিল।
আশীস করিয়া ভাট কহিতে লাগিল ॥

শুন রাজা কান্তেশ্বর করি নিবেদন।
তোমার বিবাহ বার্ত্তা করহ শ্রবণ॥
বিরলে, বিনন্দ নামে প্রজা ভাগ্যবান।
করিবে তোমারে তিনি পঞ্চ কন্যা দান॥
সুকাঞ্চনা, অকাঞ্চনা, অগ্রজা সুশীলা।
সুশীতলা, আছে আর কনিষ্ঠা বনমালা॥
গঙ্গাভাট মুখে শুনি আনন্দিত রাজা।
আনন্দিত পুরবাসী আর যত প্রজা॥
রাজা কহে শুন ভাট আমার বচন।
যাতায়াতে শুভ কার্য্য করহ ঘটন॥
এত শুনি গঙ্গাভাট দিলেন উত্তর।
এই স্থানে উপনীত শ্বশুর তোমার॥
বিনন্দ কহিল রাজা কর অবধান।
বিবাহ করহ পঞ্চ কন্যা করি দান॥
এত শুনি কান্তেশ্বর বলিল বচন।
বিবাহের দিন তুমি কর নিরূপণ॥
বিনন্দ কহিল তবে মহারাজা প্রতি।
এক নিবেদন মম আছয়ে সম্প্রতি॥
গুয়াপান কাটিব রাজা ইথে নাহি আন।
ধনের প্রয়াস নাহি রাখি তব স্থান॥
তথাপিও কুলধর্ম্ম রাখিবার তরে।
পঞ্চ কন্যায় পঞ্চশত রত্ন দেহ মোরে॥
এত শুনি কান্তেশ্বর হাসিতে লাগিল।
পঞ্চশত স্বর্ণ মুদ্রা ততক্ষণে দিল॥
এইরূপে সেই স্থানে লগ্ন-পত্র হ'ল।
শুভ দিন শুভ লগ্ন অবধার্য্য কৈল॥
বিবাহের দিন যদি হ'ল নিরূপণ।
অধিবাস পাঠাইতে বলিল তখন॥
শশীবর বিচক্ষণ কুশল কার্য্যেতে।
ভারের যতেক দ্রব্য আনিল ত্বরিতে॥

দধি চিড়া গুড় চিনি গুয়া পান আর।
ভারীর স্কন্ধেতে যাহ্ দিল শত ভার ॥
আর আর যত কিছু হয় প্রয়োজন।
বিনন্দের ঘরে শশী দিল ততক্ষণ ॥
অধিবাস পাঠাইয়া বিনন্দ ভবন।
নিমন্ত্রণ পত্র সব করিল লিখন ॥
রাজগুরু আদি করি যতেক ব্রাহ্মণ।
নিমন্ত্রণ পেয়ে সব করে আগমন ॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে কৈল অধিবাস।
বাদ্যের শব্দেতে পূর্ণ হইল আবাস ॥
হুলুধ্বনি দিল সব প্রজার কামিনী।
উল্লাসিত সবে অতি শুভ দিন গণি ॥
সুগন্ধ চন্দনে রাজা অভিষেক হইল।
এইরূপে সুখ নিশি প্রভাত হইল ॥
করিল স্নানের সজ্জা যত আয়োজন।
তৈল হরিদ্রায় রাজা হ'ল সুশোভন ॥
বিবাহের বেশভূষা করি নৃপবর।
আনন্দে চলিল রাজা বিনন্দের ঘর ॥
সঙ্গেতে অমাত্যবর্গ সকল চলিল।
হাতী ঘোড়া সৈন্য ঠাট অনেক লইল ॥
লইল আতস বাজি অতি মনোহর।
জয়ডঙ্কা বাজে দেখ অশ্বের উপর ॥
ঢোল বাজে কাঁসী বাজে বাজিছে ভেউর।
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হয় তিনপুর ॥
এইরূপে কান্তেশ্বর করিয়া সাজন।
উপনীত হ'ল যেয়ে বিনন্দ ভবন ॥
জামাতা আইল যদি আপনার ঘর।
শত কন্যা নিয়ে গেল সভার ভিতর ॥
মহারাজ বসিলেন বেদীর উপর।
শোভিত হইল রাজা যেন শশধর ॥

বেদী পূর্ব্ব ভাগে পঞ্চ কন্যা বসাইল।
চন্দ্রমা সহিত যেন রোহিণী শোভিল॥
ছিল যত দ্বিজগণ সবে বেদ পড়ে।
বিনন্দ আপন কন্যা সম্প্রদান করে॥
নানা বাদ্য জয় জয় মহা কোলাহল।
করিতে লাগিল গান গায়কের দল॥
মহা আনন্দিত হ'ল যত প্রজাগণ।
শুভলগ্ন বিবাহের কর সম্পাদন॥
এইরূপে শুভ কার্য্য করি সম্পাদন।
পঞ্চরাণী সহ রাজা যায় নিকেতন॥
পঞ্চ নারীর পঞ্চখণ্ডে অন্দর হইল।
নানা সুখে কত কেলি রাজা আরম্ভিল॥
পঞ্চজন মধ্যেতে সুশীলা পাটরাণী।
সব চেয়ে ভালবাসা বনমালা জানি॥

জলকেলি ও দুর্গাপুর নগর সংস্থাপন

বিবাহ করিয়া রাজা পুলকিত মন।
জলকেলি করিবারে করিল মনন॥
আনিল সজ্জিত করি সুন্দর তরণী।
নানা রঙ্গে গান করে যতেক রমণী॥
নানা রঙ্গে পতাকা শোভিছে সারি সারি।
কেহ বা ধরিছে কর্ণ কেহ হ'ল দাঁড়ি॥
পারিষদ সহ রাজা চড়িয়া নৌকায়।
মহানন্দে কান্তেশ্বর গোয়ারী খেলায়॥
পূর্ব্ব দিকের নৌকা যত পশ্চিমেতে যায়।
পশ্চিমের নৌকা সব পূর্ব্ব মুখে ধায়॥
উত্তরের নৌকা সব দক্ষিণে গমন।
দক্ষিণের নৌকা সব উত্তরে পয়াণ॥

এইরূপে কান্তেশ্বর গোসানী খেলায়।
আনন্দ প্রতিমা যত ভাসিয়া বেড়ায়॥
জল মধ্যে ঘুরে নৌকা পবন সমান।
মহানন্দে কান্তেশ্বর হ'ল আটখান॥
ধন্য যে পেটেলা নাম ধরে সরোবর।
জলকেলি করে যাতে রাজা কান্তেশ্বর॥
জলকেলি করি রাজার তুষ্ট হ'ল মন।
কেলি ছাড়ি বাদ বাঙ্গলা করিল গমন॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা হইল যখন।
হেন কালে নৃপবর দিল দরশন॥
ভোজনের দ্রব্য সব প্রজারা মিলায়।
স্নান করি মহারাজা আইল তথায়॥
ভোজনান্তে মহারাজা বিশ্রাম করিয়া।
বাহিরেতে বসেছেন দে(ও)য়ান করিয়া॥
হেন কালে কামিনী আইল একজন।
মরাল জিনিয়া তার মন্থর গমন॥
উর্ব্বশী মেনকা কিংবা রম্ভা তিলোত্তমা।
ইহার মধ্যেতে কেহ না হয় উপমা॥
নিকটে আসিয়া নারী ভূমিষ্ঠ হইল।
কর যোড় করি তবে কাছে দাঁড়াইল॥
তাহাকে দেখিয়া রাজা বিমোহিত মন।
সাদরে তাহার প্রতি বলিল বচন॥
কোথা বাস কিবা নাম কেন আগমন।
স্বরূপ আমার কাছে বলহ বচন॥
এত শুনি বরাঙ্গনা করিল উত্তর।
তোমার রাজ্যেতে বাস শুন নৃপবর॥
দুর্গা নটী নাম মোর বাস বালাপুর।
নাহি মোর স্বামী পুত্র, বিহীন স্বতন্ত্র॥
পুণ্যবান তুমি রাজা শুন পুণ্যধাম।
অবলা জনের পুরাবেন মনস্কাম॥

নৃত্যগীতে মম সম কেহ নাহি আর।
হয় যদি আজ্ঞা তবে শুন নৃপবর ॥
নৃত্যগীত করি আমি তুষি তব মন।
নর্ত্তকী হইব তব এই নিবেদন ॥
দুর্গার রূপেতে রাজা হইয়া মোহিত।
আবাস করিয়া দিল অতি মনোনীত ॥
সুশোভন করি তার পুরী বান্ধি দিল।
দুর্গাপুর বলি নাম তাহার হইল ॥
দুর্গার নামেতে নাম হ'ল দুর্গাপুর।
হাট ঘাট দীঘি করে যেন সুরপুর ॥
করিয়া দুর্গার পুরী অতি সুশোভন।
আপন আলয়ে যান আনন্দিত মন ॥
আপন আলয়ে রাজা হয়ে উপনীত।
বনমালা বাস গৃহে চলিল ত্বরিত ॥
বনমালার কেলিতে রাজার কুতূহল।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল ॥

রাজার শিকারে গমন

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, আদেশিল যত প্রজা,
ডাকিয়া আনহ মন্ত্রিবর।
যার যত জাল দড়ি, বর্ষি আর খাপরি,
আন যাই মারিতে শিকার ॥
বন্দুকেতে গুলি ভর, ধনুতীর ভাল কর,
সাজাইয়া আন এইক্ষণ।
হাতী মাহুত সাজুক, পৃষ্ঠে হাওদা তুলুক,
সাজাও সমস্ত সৈন্যগণ ॥

রাজার শুনিয়া বাণী, শশী পাত্র মহাজ্ঞানী,
চলে শীঘ্র দক্ষিণ সহর।
পর(ও)য়ানা জারি করি, সব লোক আনে ধরি,
আর যত বরখি থাপর॥
রাজা কহে শুন প্রজা, উড়াইয়া লও ধ্বজা,
মৃগয়া করিতে যাই চল।
সাজিল যে হস্তি হয়, বাজেতে আনন্দময়
লোকজন করে কোলাহল॥

আইল গণকাচার্য্য করিতে গণনা।
রাজারে শিকারে যেতে করিলেন মানা॥
বিশাখা নক্ষত্র আজি আর শুক্রবার।
পশ্চিমে যাইলে পর না মিলে শিকার॥
দিক্ শূল করি যদি শিকারে যাইবে।
শিকার পাবে না আর প্রাণে কষ্ট পাবে॥
বিশেষ ত্র্যহস্পর্শ হয় আজিকার দিন।
কোন দিকে যাত্রা নাই শুনহ প্রবীণ॥
জ্যোতিষে কহেন শুন রাজা কান্তেশ্বর।
যোগে উক্ত আছে এই মৎস্যের উপর॥
মৎস্য না মারিয়া যদি মৃগয়ায় যাবে।
শিকার পাবে না প্রভু বহু কষ্ট পাবে॥
গণিয়া পড়িয়া আমি কহিলাম সার।
হিত উপদেশ দিনু যা ইচ্ছা তোমার॥
শুনিয়া গণক মুখে বিস্ময় রাজন।
মৃগয়া যাইতে রাজা করিলা বারণ॥
হুকুম করিলা রাজা আন জালী ধরি।
কাজিলী কুড়ায় জাল ফেল মৎস্য মারি॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া দূত ধায় কোতয়ালে।
যেখানে জালুয়া পায় ধরে বাহুবলে॥

ঘরে ঘরে ফিরি করে জালুয়া উদ্দেশ।
জালুয়া না পেয়ে দূত ভাবে মহাক্লেশ॥
সেই গ্রামে মধুজালী দরিদ্রের ধাম।
তার নারী মহাসতী ধরে সীতা নাম॥
ঘরে অন্ন নাহি তার পরিতে বসন।
ঘরের কোণায় লুকি আছে দুইজন॥
সেই ঘরে কোতয়াল প্রবেশ করিল।
ঘাড়ে ধরি জালুয়াকে বাহির করিল॥
ঘাড়ে জাল দিয়া তারে টানি লৈয়া যায়।
দোহাই কামেশ্বরের বলি তার নারী ধায়॥
ধাক্কা দিয়া জেলেনীকে দূত গালি পাড়ে।
যাহার দোহাই দিস্ সেই ধরে তোরে॥
মোর স্বামী ধরি লয় কি করি উপায়।
পশ্চাতে কান্দিয়া যায় করে হায় হায়॥
রাজ বিদ্যমানে কোতাল, জালী আনি দিল।
কর যোড়ে চণ্ডালিনী দাঁড়ায়ে রহিল॥
কোতয়াল কহে রাজা কর অবধান।
পলাতক সব জালী পাই একজন॥
জালীকে কহিল রাজা নাহি কোন ডর।
কাজিলী কুড়ায় যেয়ে তুই মৎস্য ধর॥
জালীকে লইয়া দূত কুড়ায় চলিল।
সসৈন্যে সাজিয়া রাজা সে স্থানে চলিল॥
ডরে কম্পমান জালী জাল ফেলাইল।
পঞ্চ ক্ষেপ দেয় তবু মৎস্য না উঠিল॥
আর বার ফেলে জাল মৎস্যের কারণ।
টানিতে না সরে জাল ভাবে মনে মন॥
কাছি ধরি মধুজালী টানিতে লাগিল।
স্তব্ধ হ'য়ে জালী শেষে কোমর বান্ধিল॥
কাছিটা ধরিয়া জলে ডুবে জালী বর।
বিদ্যমান এক মঠ জলের ভিতর॥

কাছি ছাড়ি দিল জাল সরিয়া আইল।
বহু কষ্টে জালুয়া যে উপরে উঠিল॥
জালী কহে শুন রাজা কর অবধান।
সুবর্ণ সদৃশ মঠ জলে বিদ্যমান॥
জালের বাড়িতে মৎস্য মঠ মধ্যে যায়।
কি মতে মারিব মৎস্য না দেখি উপায়॥
জালী বাক্য শুনে রাজা চমৎকৃত হ'ল।
মনেতে বুঝিল রাজা চণ্ডী মায়া কৈল॥
নিশ্চয় চণ্ডীকা আজি ভাড়াইলা মোরে।
সে হেতু জালীর জাল মঠে ঘেরে ধরে॥
ভবানী ভাবিয়া রাজা সুস্থির হইল।
পুনরায় ফেল জাল এ আদেশ দিল॥
রাজার আদেশে পুনঃ জালী জাল ফেলে।
ভয়ঙ্কর এক শোল মাছ ধরে তোলে॥
শিমুলের বৃক্ষে এক সাচাল[১] আছিল।
জালী হাতে ছুঁই দিয়া মাছ নিয়া গেল॥
ভয়ঙ্কর চিল দেখি জালুয়া চঞ্চল।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল॥

মৎস্য হারাইয়া জালীর রোদন

চিলা মাছ নিয়া গেল, হাত মোর ভাঙ্গি গেল,
বিধি মোর কৈলা বিড়ম্বন।
কাছি যে ধরিতে নারি, কেমনে যে মৎস্য মারি,
রাজা মোর বধিবে জীবন॥
বিলাপ করিয়া কাঁদে, পড়িয়া বিষম ফাঁদে,
আজি মোর জীবনে নৈরাশ।
মৎস্য না পেয়ে রাজা, ক্রোধে মোরে দিবে সাজা,
আজি মোর হ'ল সর্ব্বনাশ॥

---

১ সাচাল—বাজপাখী : সাচান—শ্যেনপক্ষী (বঙ্গীয় শব্দকোষ)।

এযত্নে কান্দিল জালী, দুই চিল মহাবলী,
মৎস্য ধরি উঠিল উপরে।
এক দণ্ড ধরি ছিল, চিলা শক্তিহীন হৈল,
সীতার নিকটে মৎস্য পরে॥
চিলেরে দেখি নৈরাশ, সীতার হইল হাস,
রূপবতী পক্ষী পানে চায়।
সীতার দেখিয়া হাসি, মধুজালী ক্রোধে ভাসি,
কটু বাক্য বলিছে অপার॥
কঠোর জীবন তব, স্বামী দুঃখ নাহি ভাব,
আজি তোর বধিব জীবন।
লাঠী ধরি মারে বাড়ি, কান্দে সতী হাহা করি,
প্রাণ রাখ করি নিবেদন॥
দুই জনে জড়াজড়ি, পড়ে তবে ভূমি 'পরি,
লোকে দেখি হইল চঞ্চল।
কোতয়াল দেখি ধায়, রাজার আগেতে যায়,
ভণে কবি গোসানী-মঙ্গল॥

যোড় হাতে কোতয়াল করে নিবেদন।
জালী জালিনীর কথা শুনহ রাজন॥
এক গোটা মহা শোল জালে উঠেছিল।
ছুঁই দিয়া সেই মাছ সাচানে লইল॥
হস্ত চিবা গেল জালী করিছে ক্রন্দন।
মাছ না পাইলে রাজা বধিবে জীবন॥
জালী যে চিন্তিত অতি জালিয়ানী হাসে।
ক্রোধে জালী তারে বাড়ি মারিয়াছে ত্রাসে॥
অবশেষে দুই জনে করে জড়াজড়ি।
সুবিচার কর রাজা উভয়েকে ধরি॥
এত শুনি আজ্ঞা করে রাজা কান্তেশ্বর।
ধরিয়া আনহ দোঁহে আমার গোচর॥

আদেশে কোতাল গিয়া আনে দুই জনে।
জিজ্ঞাসেন রাজা দোঁহে দন্দ কি কারণে॥
জালী কহে শুন রাজা ইহার উত্তর।
কাটৈ এক শোল মারি জলের ভিতর॥
বহু কষ্টে বহু যত্নে ধরি বাহুবলে।
উপরে তুলিতে তাহা দেখিল সাচালে॥
হস্ত চিরে মৎস্য গেল মনে হ'ল ত্রাস।
তাহা দেখি মোর নারী করে উপহাস॥
সে কারণে দুইজনে করি জড়াজড়ি।
দোষ গুণ দেখ রাজা মনেতে বিচারি॥
এতেক শুনিয়া রাজা বিস্ময় হইলা।
কহ চণ্ডালিনী তুমি কি হেতু হাসিলা॥
চণ্ডালিনী কহে কথা যোড় করি কর।
যে হেতু হাসিনু আমি শুন কান্তেশ্বর॥
পতিকে দেখিয়া আমি হাস্য নাহি করি।
হাসিনু সাচালে দেখি কহিনু বিস্তারি॥
পূর্ব্বেতে শ্রীবৎস রাজা ছিলেন বেহারে।
শনি পীড়া অবসানে গেল স্বর্গ পুরে॥
এই মতে অরাজক কত কাল ছিল।
ভগদত্ত নামে রাজা বেহারে হইল॥
দ্বাপরেতে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হৈল।
দুর্য্যোধন ভগদত্ত রাজারে বরিল॥
ভগদত্ত মহাবীর বৈষ্ণব গম্ভীর।
যুদ্ধ করি পাণ্ডবেরে করিলা অস্থির॥
ভগদত্ত মহাবলী ধার্ম্মিক প্রধান।
গয়াতে যাইয়া তিনি দেন পিণ্ডদান॥
কাশী যাইয়া করেন শিব দরশন।
জগন্নাথে গিয়া করে প্রসাদ ভক্ষণ॥
কৃষ্ণের মন্ত্রণা বলে পার্থ মহাবীর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে ভগদত্ত শির॥

চণ্ডীর কবচ এক তার হাতে ছিল।
সকবচ বাহু পার্শ্ব কাটিয়া ফেলিল॥
অতি দীর্ঘ মহাবাহু পড়িয়া রহিল।
ছুঁই দিয়া চিল তাহা উঠাইয়া নিল॥
বাহু ল'য়ে চিল আকাশে গমন করে।
গগনের পথে আসে বেহার নগরে॥
বজ্র সম হাত চিল আনিল তুলিয়া।
খাইল সকল মাংস এবৃক্ষে বসিয়া॥
উদর পূরিয়া চিল বাহু ফেলি দিল।
বৃক্ষের গোড়ায় তাহা তল হইয়া রৈল॥
সেই চিল আসি এই শোল মৎস্য ধরে।
রাখিতে না পারে শোল ভূমিতলে পড়ে॥
হাসিনু চিলাকে দেখি পূর্ব্ব কথা স্মরি।
না বুঝিয়া মহারাজ স্বামী মারে ধরি॥
দোষগুণ বুঝে রাজা কর সুবিচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায় বুঝহ কাহার॥
মম নিবেদন রাজা এ সত্য কথন।
স্বামী দেখি নাহি হাসি কহিনু বচন॥
রাজা বলে তব কথা যদি সত্য হয়।
কোথা আছে সেই বাহু দেখাও আমায়॥
চণ্ডালিনী বলে রাজা করি নিবেদন।
এই শিমূলের গোড়া করাও খনন॥
দেখিবে কবচ যদি ক্ষয় নাহি হয়।
তবে সে আমার কথা হইবে প্রত্যয়॥
রাজার আদেশে গাছের গোড় খোঁড়াইল।
একাদশ হস্ত তলে বাহু দেখা গেল॥
মাংস ক্ষয় হইয়াছে অস্থিমাত্র সার।
তার মধ্যে কবচ গোটা অতি চমৎকার॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া কবচ গোটা জ্বলে।
বহু দিন গত তবু আছয়ে উজ্জ্বলে॥

দেখিয়া কবচ ভাতি হরে মন প্রাণ।
স্ফটিক নির্ম্মিত সবে করে অনুমান॥
যে কূড়ায় সেই কবচ উদ্ধার হইল।
স্ফটিক কূড়া বলি তার নাম রাখা হ'ল॥
গোসানী কবচ বলি তাহে ছিল লেখা।
মুক্তার পাঁতি সম অক্ষর দিল দেখা॥
কাজিলা কূড়ায় আনি কবচ ধুইল।
তাহে তার বর্ণ ভাতি দ্বিগুণ বাড়িল॥
জালিনীর বাক্য সত্য জানিল রাজন।
পুনঃ তারে কান্তনাথ কহেন বচন॥
কেমনে জানিলে ইহা বল সত্য ক'রে।
কোন পাপে জন্ম হ'ল চণ্ডালের ঘরে॥
পূর্ব্ব জন্মে কোন জাতি ছিলা সিমন্তিনী।
বলহ স্বরূপ কথা সব আমি শুনি॥
অনুমানে বুঝিয়াছি রমণীর সার।
ভয় ত্যজি গুণবতী তত্ত্ব কহ তার॥
চণ্ডালিনী বলে রাজা শুন আদি অন্ত।
কহিব যতেক কথা পূর্ব্বের বৃত্তান্ত॥
এত বলি চণ্ডালিনী কহে পূর্ব্বাপর।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানীর বর॥

ত্রিপদী

যুড়িয়া যুগল পাণি, বলিলেন চণ্ডালিনী,
কহি শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
কহিতে দুঃখের কথা, মরমে লাগয়ে ব্যথা,
মোর দুঃখ না যায় কহন॥
ব্রাহ্মণের কন্যা আমি, পাইয়া উত্তম স্বামী,
ছিনু দোঁহে দিবসযামিনী।
আপনার কর্ম্মদোষে, বিধি মোর প্রতি রোষে,
কহি শুন দুঃখের কাহিনী॥

সতী পতি দুই জনা, কৃষ্ণ মন্ত্রে উপাসনা,
আমরা ভজিহে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ আমাদের গতি, কৃষ্ণপদে রাখি মতি,
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানি আন॥
পরম বৈষ্ণব হৈয়া, ছাড়িনু সংসার মায়া,
এইরূপে কাটি কত কাল।
হরি নাম গুণ গাই, নিরামিষ সদা খাই,
এইরূপে বার্দ্ধক্য ঘটিল॥
শুনিলে আমিষ নাম, মুখে বলি রামনাম,
পরে শুন ঘটে যে প্রকার।
মৎস্য মাংস সবে খায়, দেখে মোর মনে চায়,
মৎস্য বুঝি সুখাদ্য আহার।
কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করি, তাহে মাংস খাইতে নারি,
মনে মোর জন্মিল বিকার।
এইরূপে আয়ু শেষ, কাল আসি করে শেষ,
ধরিয়া লইল যম পুরে॥
চিত্রগুপ্ত আগুসারি, কহে কর যোড় করি,
শুন ধর্ম্ম করি নিবেদন।
পুণ্যবতী এই সতী, কৃষ্ণপদে সদা মতি,
কৃষ্ণপদে বাঁধা সর্ব্বক্ষণ।
হইয়া কৃষ্ণের ভক্ত, শাক্ত ভক্ত উপযুক্ত,
মাংসলুব্ধ ছিল মৃত্যুকালে।
ক্রোধে কহে ধর্ম্মরাজ, যেমত করিল কাজ,
সেই হেতু জন্মুক নীচ কুলে॥
শুন ওহে নরবর, এই হেতু জন্ম মোর,
এই নীচ চণ্ডালের ঘরে॥
পূর্ব্বে যাহা করিলাম, তাহার এ পরিণাম,
বুঝি রাজা কহিনু তোমারে॥
নিষ্ঠা ভিন্ন সাধনার, ফল নাহি জান সার,
দ্বিধা মনে কিছু নাহি হয়।

এক মনে ভজ গুরু, পাবে হরি কল্পতরু,
বিশ্বাসেতে সর্ব্ব ফলোদয় ॥
চাণ্ডালিনীর বাক্য শুনি, মনে সত্য অনুমানি,
সুস্থ নহে মন যে চঞ্চল।
নিষ্কামে ভজিলে হরি, অন্তে যাবে স্বর্গপুরী,
ধর্ম্মাধর্ম্মের জান এই ফল ॥

গোসানী স্থাপন ও চণ্ডালিনীর প্রতি পূজার ভারার্পণ এবং দেউরী[১] কার্য্য প্রদান

সসৈন্যে সাজিয়া রাজা করিল গমন।
চণ্ডী মণ্ডপেতে আসি দিল দরশন ॥
পঞ্চ গব্যে গোসানীরে করাইয়া স্নান।
সিংহ পৃষ্ঠে গোসানীর দিলেন আসন ॥
রাজগুরু শুক্র দ্বিজ, চণ্ডী করে পূজা।
লক্ষ বলি দিতে আজ্ঞা করিলেন রাজা ॥
রাজ আজ্ঞামত লোক চারি দিকে ধায়।
ছাগ মহিষ পারাবত আনিয়া যোগায় ॥
আতপ কদলী চিনি জবাদি শ্রীফল।
আনিল যতেক পুষ্প সেবার সকল ॥
রাজা বলে শুন জালী আমার বচন।
নারী সহ পঞ্চগব্যে কর তুমি স্নান ॥
পরম বৈষ্ণব তুমি ব্রাহ্মণ সুধীর।
কে তোমা চণ্ডাল কহে কর মন স্থির ॥
স্নান করি আয়োজন আনহ পূজায়।
সমর্পণ কৈনু তোরে পুষ্পের ভাণ্ডার ॥
সেইক্ষণ স্নান করি পুষ্প আনি দিল।
ফুল তোলা দেউরী নাম তাহার হইল ॥
রাজগুরু হয় সেই মৈথিলী ব্রাহ্মণ।
রাজার আদেশে পূজে গোসানীচরণ ॥

---

১ দেবীর পরিচারকদিগকে দেউরী বলে।

ছাগ মহিষাদি বলি দিল নিরন্তর।
তুষ্ট হ'য়ে গোসানী রাজাকে দিল বর॥
কান্তেশ্বর হ'ল গোসানীর অধিকারী।
সেই হেতু তার নাম হ'ল কান্তেশ্বরী॥
নানা বাদ্য, কোলাহল করে হুড়াহুড়ি।
নৃত্যগীত কত বন্দুকের ছুড়ছুড়ি।
মহা আড়ম্বরে রাজা পূজা শেষ কৈল।
মস্তক নমিয়া শেষে নির্ম্মাল্য লইল॥
এই মতে গোসানীরে করিল স্থাপন।
নানা দেশী লোক আসি করে দরশন॥
কার্ত্তিক বৈশাখ মাসে মেলার সময়।
পূজিলে গোসানী পদ ইষ্ট সিদ্ধ হয়॥
পূজা অবসানে রাজা আইল গৃহেতে।
সবে ঘরে চলি গেল যে যার বাসেতে॥
বনমালা গৃহে রাজা রহে কুতুহলে।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গলে॥

কান্তেশ্বরের মৃগয়ায় গমন ও নানা স্থানে দেবদেবী প্রতিষ্ঠা

প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্নান দান কৈল।
অতিথি ব্রাহ্মণগণে সুখে ভুঞ্জাইল॥
সৈন্যসহ মহারাজ করিল গমন।
রঙ্গপুর[১] ঘোড়াঘাটে দিল দরশন॥
পূর্ব্বেতে বিরাট রাজা ঘোড়াঘাটে ছিল।
অশ্ব গো পালন যাহে পাণ্ডব করিল॥
করি ঘোড়াঘাট জয় পূর্ব্ব দিকে যায়।
পাঙ্গা নামে রাজ্য তথা উত্তরে যবায়॥

---

১ বর্ত্তমানে রংপুর (বাংলাদেশ) জিলায় অবস্থিত। রাজা নীলাম্বর তাঁহার রাজ্যকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এখানে সদৃশ্য গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মৃগয়া করিব আজি রাজা আজ্ঞা দিল।
পাহাবাসী প্রজাগণ জাল আনি দিল॥
ভয়ে কম্পমান প্রজা পলাইতে চায়।
তাহা দেখি মহারাজ দিলেন অভয়॥
রাজ সৈন্য পাহাবাসী একত্র হইয়া।
ভালুকের বন ঘেরে উৎসাহে মাতিয়া॥
রাজা বলে এই বন সবে জালে ঘিরে।
ভালুকের ছানা এক আনি দেহ মোরে॥
আজ্ঞা পেয়ে সেনাগণ জঙ্গল বেড়িল।
আর কত লোক জন বনে প্রবেশিল॥
হস্তী পৃষ্ঠে তন্নে তন্নে বন নিরখিল।
ভালুকের শিশু তবু কোথা না মিলিল॥
মনে মনে ভাবে রাজা করে অনুমান।
আমারে দেখিয়া ভালুক গেল অন্যস্থান॥
রজনীতে রহে তথা ছাউনী করিয়া।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা আছেন বসিয়া॥
হেন কালে দেখে রাজা ভালুক একটা।
তিন শিশু সহ তথা আছে তার মাতা॥
ধরিবার তরে রাজা করিল যতন।
কোথায় পলায় তারা না হয় সন্ধান॥
এইরূপে পুনঃ দেখে পুনঃ তথা যায়।
ইহা দেখি মহারাজ উপায় না পায়॥
অবশেষে সেই বনে অগ্নি লাগাইল।
ভয়ঙ্কর হুতাশন জ্বলিতে লাগিল॥
সমস্ত পুড়িল বন মধ্যে নাহি পোড়ে।
তাহা দেখি মহারাজ চিন্তিত অন্তরে॥
অগ্নি নিবাইয়া তথা কামেশ্বর গেল।
সুবর্ণের শিবলিঙ্গ তথা দেখা দিল॥
শার্দ্দূল ভল্লুক মৃগ না পাইয়া বনে।
ক্ষুব্ধ হ'ল মহারাজ দিবা অবসানে॥

গ্রামের প্রধান এক শ্রীরাম পোদ্দার।
সেই আনি দিল রাজার খাদ্য উপহার॥
নিশা ভোজনের পরে রাজা নিদ্রা যায়।
শিয়রে বসিয়া শিব স্বপন দেখায়॥
শুন শুন কান্তেশ্বর বচন আমার।
এই বনে থাকি আমি নাম কোটেশ্বর॥
জগদন্ত স্থাপিত আমি জানিবা নিশ্চয়।
যশঃ পাবে মহারাজ পূজিলে আমায়॥
প্রকাশ হইব বলি মনে ইচ্ছা কৈনু।
ভালুকের রূপে আমি তোরে দেখা দিনু॥
বন ঘেরি অগ্নি দিলা ছাও না পাইলা।
কোটেশ্বর লিঙ্গ আমি যে দেখিলা শিলা॥
কান্তেশ্বরী কোটেশ্বর ভিন্ন দেহ নয়।
করিলে আমার পূজা রাজ্য সিদ্ধ হয়॥
এতেক কহিয়া শিব অন্তর্দ্ধান হ'ল।
প্রভাতে চৈতন্য পেয়ে নৃপতি উঠিল॥
শ্রীরাম পোদ্দারে ডাকি আনে কান্তেশ্বর।
আদেশিলা তারে রাজা মঠ বান্ধিবার॥
কারুকার্য্যে মঠ গোটা করিয়া নির্ম্মাণ।
শুভ তিথি যোগে লিঙ্গ করেন স্থাপন॥
ধূপ দীপ চন্দনাদি পুষ্প বিল্বদলে।
ব্রাহ্মণ সহিত পূজা করে কুতূহলে॥
এইরূপে পাঙ্গা মধ্যে স্থাপি কোটেশ্বর।
উক্ত নামে অদ্যাবধি খ্যাত চরাচর॥
শিব প্রণমিয়া রাজা হইল বিদায়।
তদন্তরে পূর্ব্ব দিকে সৈন্য সহ যায়॥
সেই দেশের বন মধ্যে কৃষ্ণসার[১] দেখে।
ধরিবার আশে বন ঘেরে চতুর্দ্দিকে॥
মৃগ না পাইয়া রাজা হৈল পরিশ্রান্ত।
বিধি বিড়ম্বনা ইহা ভাবিল নিতান্ত॥

---

১ হরিণ।

নিদ্রা অবসানে রাজা পরবাস মনে।
সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী কহেন স্বপনে॥
শুন শুন কান্তেশ্বর আমার বচন।
জগদ্বন্ধু কাশিত্ত আমরা দুইজন॥
সিদ্ধেশ্বরী বানেশ্বর এই দুই নাম।
কান্তেশ্বরী কোটেশ্বর জান আর নাম॥
একই শরীর রাজা জানিবা নিশ্চয়।
করিলে আমার পূজা বাড়িবে বিষয়॥
স্বপ্ন দেখাইয়া দেবী হ'ল অন্তর্দ্ধান।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করে স্নান দান॥
বন মধ্যে পায় রাজা লিঙ্গ বানেশ্বর।
সিদ্ধে বিগ্ন পায় দুই তাহার কোঙর॥
স্বপনে জানিল রাজা সিদ্ধেশ্বরী সুত।
দেখিয়া শুনিয়া রাজা হইল বিস্মিত॥
শ্রীরাম পোদ্দারে আনি মঠ নির্ম্মাইল।
দুই মঠে দুই দেবে স্থাপন করিল॥
দ্বিজগণে নিয়োজিল পূজা করিবারে।
সিদ্ধেশ্বরী বানেশ্বরে নানা উপচারে॥
সিদ্ধেশ্বরী বানেশ্বর স্থাপন করিয়া।
তথা হ'তে মহারাজ গেলেন চলিয়া॥
সৈন্য সেনাগণে রাজা সঙ্গেতে লইয়া।
কতদিনে বিশপুরে উত্তরিল গিয়া॥
বৃষভ বাতানে[1] দেখে গাই আর বাছুর।
বন মধ্যে দেখে গরু আমোদ প্রচুর॥
গো বিহনে বনে নাহি দেখি মৃগদার।
বন মধ্যে এত গরু কিবা চমৎকার॥
ধরমের স্থান এই বুঝে অনুমানে।
রাজা কহে শীঘ্রগতি ঘের এই বনে॥
ধরিয়া লইব গাভী আপনার বাড়ী।
রাজার আদেশে বন ঘেরে ত্বরা করি॥

১ বাতান < বাথান—গোচারণ মাঠ।

পলাইল গাভীগণ অলক্ষিত ভাবে।
তাহা দেখি মহারাজ লাগিল চিন্তিতে॥
চমৎকৃত নৃপবর গাভী না পাইয়া।
দিবা শেষে র'ল তথায় ছাউনী করিয়া॥
স্বপনে কহিল নৃপে শুন কান্তেশ্বর।
ধর্ম্মপাল নামে এক বসাও নগর॥
আমি ধর্ম্মদেব হই আছি এই বনে।
সর্ব্বদা থাকি আমি এ গাভীর বাতানে।
স্বপনে বলিয়ে ধর্ম্ম অন্তর্দ্ধান হ'ল।
প্রভাত হইল রাজা জাগিয়া উঠিল॥
শ্রীরাম পোদ্দারে আনি বন কাটাইল।
ধর্ম্মপাল নগর নাম বনের রাখিল॥
এই রূপে ধর্ম্মপাল হাট হ'ল স্থাপন॥
তথা হ'তে বনান্তরে রাজার গমন॥
সেই বনে বৃষ এক ধবল বরণ।
সুবর্ণের ঘণ্টা গলে বাজে ঠন্ ঠন্॥
বৃষভ ধরিতে রাজা করিল মনন।
সৈন্যগণে আজ্ঞা দিল ঘের এই বন॥
বৃষ না পাইয়া রাজা হইল হতাশ।
সেই বনে রজনীতে করে পরবাস॥
নিশা ভাগে মহাদেব কহে নৃপস্থান।
জগদত্ত স্থাপিত আমি জল্পেশ্বর নাম॥
করহ আমার পূজা ওহে কান্তেশ্বর।
তব যশঃ ঘোষিবেক এ তিন সংসার॥
শিব অন্তর্দ্ধান হইলে জাগে নৃপবর।
স্বপনের কথা কহে মন্ত্রীর গোচর॥
মন্ত্রীগণে কহিয়া সে স্বপনের কথা।
বন অন্বেষিয়া লিঙ্গ পাইলেন তথা॥
আশ্চর্য্য হইল রাজা পেয়ে শিবলিঙ্গ।
আচম্বিতে দেখে তথা মনোহর কুণ্ড॥

শ্রীরাম পোদ্দারে বলি মঠ নির্ম্মাইল।
ব্রাহ্মণ আনিয়া শিবলিঙ্গ পূজা কৈল॥
জল্পেশ্বর বলি রাজা রাখে তার নাম।
অবনী লোটিয়া পরে করিল প্রণাম॥
এই রূপে বনে বনে ফিরেন রাজন।
কোটেশ্বরে পঞ্চ দিন করেন যাপন॥
বানেশ্বরে দুই দিন ছিল পরবাস।
ধর্ম্মপালে এক দিন পাণ্ডী অভিলাষ॥
জল্পেশ্বরে এক দিন রহে নৃপবর।
সমুদায় নয় দিন বন বনান্তর॥
রাজা বলে শুন শশী আমার বচন।
চলহ এক্ষণে সবে আপন ভবন॥
কান্তেশ্বর গৃহে আসে সৈন্য কোলাহল॥
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল॥

রাজার গৃহে আগমন ও গোসানীর হাট স্থাপন

আপন পুরীতে রাজা আইসে শীঘ্র করি।
হেন কালে নিকটেতে দেখে এক পুরী॥
রাজা কহে শুন শশী এই পুরী কার।
ইহার সৌন্দর্য্য দেখি লাগে চমৎকার॥
শশী বলে মহারাজ করি নিবেদন।
এর মধ্যে রহে শশী তোমার দেওয়ান॥
অনুগ্রহ হয় যদি চল একবার।
এতেক শুনিয়া যায় রাজা কান্তেশ্বর॥
শশীর গৃহেতে রাজা করিল গমন।
শশী পুত্র মনোহর দিলেন আসন॥
স্নান দান করি রাজা করিল ভোজন।
বিশ্রাম করিয়া রাজার তুষ্ট হ'ল মন॥
নৃপ কহে শুন শশী আমার বচন।
কাহার আত্মজ এই দেখি সুলক্ষণ॥

শশী কহে মহারাজ ধর্ম অবতার।
তোমার পালিত এই আমার কুমার॥
মনোহর নাম এর করি নিবেদন।
শুনি চমকিত রাজা হইল তখন॥
মনে মনে ধন্য ধন্য কহে নরবর।
শশী গৃহে হেন পুত্র নাম মনোহর॥
মনেতে ভাবিয়া রাজা কিছু না কহিল।
শশীর আবাস ত্যজি গৃহেতে চলিল॥
গোসানীর স্থানে আসি দিল দরশন।
আদেশ করিল রাজা শুন সর্ব্বজন॥
যার গ্রামে যত ফুল আছে যেই স্থানে।
সকল পুষ্পের চারা আন এই খানে॥
প্রাচীর ভিতরে এনে কর ফুল বন।
তাহার মধ্যেতে হাট করহ স্থাপন॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া লোক চারি দিকে ধায়।
নানাবিধ ফুল চারা আনিয়া যোগায়॥
নাগেশ্বর কেতকী জবা অশোক পলাশ।
ইন্দ্রকমল স্থলকমল ভ্রমর বিলাস॥
গন্ধরাজ চম্পক করবী আদি করি।
শ্বেত জবা নীল জবা রোপে সারি সারি॥
কাঠ মল্লিকা আদি আর বেলী ফুল।
আমলকী সূর্য্যমুখী রোপিল শ্রীফল।
শেফালিকা গোলাপাদি কত লব নাম।
সৃজিল পুষ্পের বন দেখিতে সুঠাম॥
তার মধ্যে পাতে হাট দক্ষিণ বাহিনী।
গোসানীর হাট বলি তাহারে বাখানী॥
আপনি বসায় হাট রাজা কান্তেশ্বর।
গোসানীগঞ্জ[1] বলি নাম রাখিলেন তার॥

---

১ গোসানী হাটের অপর নাম। বর্ত্তমানে অপ্রচলিত।

নরেশ্বর বলিলেন শচীপাত্র ওরে।
ধন উথলিছে মোর গোসানীর বরে ॥
করহ আঠার কোঠা ধন রাখিবার।
পুরীর পশ্চিম দিকে সৌধ মনোহর।
পাত্রে আদেশিয়া রাজা পুরী মধ্যে গেল।
বনমালা গৃহে গিয়া আনন্দে রহিল ॥
হেথা শচীবর মনে করিয়া বিচার।
সূত্রধর সহ গেল কোঠা বান্ধিবার ॥
বান্ধিল আঠার কোঠা প্রকোষ্ঠ করিয়া।
লক্ষ লক্ষ ধন নিল শকট পূরিয়া ॥
চৌকী প্রহরী দিল ধনের কারণ।
শত শত সিপাহী তথা রহে অনুক্ষণ ॥
সুবর্ণ মণ্ডিত রাখে হাতী এক গোটা।
প্রত্যেক কোঠায় রহে হাতী গোটা গোটা ॥
আট দিন কোঠা ভরে রজত কাঞ্চনে।
আঠারো কোঠা[1] নাম তার ঘোষে সর্ব্বজনে ॥
তথা হ'তে শচীবর করিয়া গমন।
আপন আলয়ে আসি দিল দরশন ॥
পক্ষ দিনে কোঠা বান্ধা হইল সুঠাম।
পূরিল সকল কোঠা কহে নৃপস্থান ॥
এতেক শুনিয়া রাজা প্রফুল্ল হইল।
বিদায় হইয়া শেষে নিজ পুরে গেল ॥
মনোহর পুত্র সহ করে সম্ভাষণ।
এই মতে শচীপাত্র সুখী সর্ব্বক্ষণ।
রাজদ্বারে সৈন্যগণ কোলাহল করে।
ধর্ম্মশীল মহারাজা সবে বলে তারে ॥
সর্ব্বদাই জয় জয় আনন্দ বাদন।
কান্তেশ্বর সম রাজা নাহি ত্রিভুবন ॥

---

১ রাজধানীর সাবারু দক্ষিণে টাকশালের ভিতরে সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত আঠারটি কোঠা (ঘর) নির্মিত হয়। সেইজন্য আঠার কোঠা নাম।

বিদায় দিলেন রাজা প্রজা পুরে গেল।
আনন্দ অন্তরে সবে গৃহেতে চলিল॥
শীতল আবাসে রাজা সর্ব্বদা শীতল।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল॥

রাজপদে সুখ ভোগে আছে কান্তেশ্বর
দীন দুঃখী নাহি রয় রাজ্যের ভিতর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বনমালা রাণী হ'তে রাজ্যের পতন।
নানামতে করে কেলি বনমালা সঙ্গে।
মনোহরের রূপ বলে কথার প্রসঙ্গে॥
তাহা শুনি বনমালা অন্তরে উল্লাস।
গুপ্ত ভাবে তার সহ দর্শনের আশ॥
অসাধু উপায়ে শেষে হ'ল মিলন।
উভয় উভয়ে দেখি বিমোহিত মন॥
সুরঙ্গ করিয়া যায় বনমালা ঘরে।
মধ্যেতে করিয়া পথ তোলা সরোবরে॥
বনমালা গৃহে যায় বিধির নির্ব্বন্ধ।
ভণে কবি মনোহরের ভাগ্য হয় মন্দ॥

* * *

সেই পথে গুপ্ত ভাবে যায় শশীপুত্র।
ক্রমে রাজা জ্ঞাত হয় রাণীর চরিত্র॥
পাপ কার্য্য পাপ কথা ছাপা নাহি রয়।
বস্ত্র আচ্ছাদিলে অগ্নি আরো বৃদ্ধি হয়॥
সভাস্থলে মহারাজ পাত্রে আদেশিল।
শীতল আওয়াসে ঘোর দস্যু প্রবেশিল॥
বৃথা পালি পাত্র মিত্র বৃথা নগরপাল।
না ধরিলে সেই দুষ্টে ঘটিবে জঞ্জাল॥
কেবা যায় অন্দরেতে করহ সন্ধান।
নতুবা সবার আজি বধিব পরাণ॥

শীতল আবাসে পাত্র চৌকী বসাইল।
সমস্ত নগর মধ্যে দূত নিয়োজিল॥
হেন মতে আছে সবে নগরে জাগিয়া।
দেখা মনোহর চলে মদনে মাতিয়া॥
সরোবর জল মধ্যে গিয়া ডুব দিল।
প্রহর হইল গত তবু না উঠিল॥
সরোবর তটে ছিল প্রহরী একজন।
তাহা দেখি পাত্র স্থানে করে নিবেদন॥
ইহা শুনি পাত্রবর মনেতে করিল।
সুরঙ্গের পথে চোর অন্দর ঢুকিল॥
মনেতে করিয়া স্থির কহিল তখন।
যে হয় সে হয় চোর বধিব এখন॥
ডেরু[১] পাতিয়া রাখ সুরঙ্গের দ্বারে।
অবশ্য ফিরিবে চোর আপনার ঘরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পাত্র আপনার মনে।
আশিমণ লোহা দিল কর্ম্মিগণ স্থানে॥
লোহার শব্দেতে দেখ কর্ণে লাগে তালি।
ইহাতে বোধিল[১] দেবী আপনি ভবানী॥
শাপ দিলা মহামায়া শুন মন্ত্রীবর।
ডেরুতে মরিবে তোর পুত্র মনোহর॥
স্থানান্তরে লহ হাপর পশ্চিমের ভাগে।
শুনিয়া লোহার বাড়ি কর্ণে তালি লাগে॥
একথা শুনিয়া তাহা পশ্চিমে লয়ে যায়।
অদ্যাপি গোসানী লোহার বাড়ি নাহি সয়॥
দৈব বাণী শুনি পাত্র হইল ফাঁপর।
কি হেতু মরিবে মোর পুত্র মনোহর॥
রাজাজ্ঞা পালিতে মোরে শাপে কাত্তেশ্বরী।
দাস হ'য়ে রাজাদেশ লঙ্ঘিতে না পারি॥

---

১ ফাঁদ।

শীঘ্র লয়ে যাহ ভেক বলে শশীবর।
নিশ্চয় ধরিব চোরে ঘুচে যাবে ডর॥
নির্ম্মাইল ভেক গোটা কর্ম্মকারগণ।
শশীর সাক্ষাতে আনি কৈল সমর্পণ॥
শশী বলে বীরকেতু অবধান কর।
সুরঙ্গে বসাও ভেক চোরে ধরিবার॥
ভেক নিয়া বীরকেতু সুরঙ্গে বসায়।
মনোহর বাণীস্থানে হইল বিদায়॥
তথা হইতে মনোহর বিদায় হইল।
সুরঙ্গের পথে আসি ভেকতে ঢাকিল॥
ভেক মধ্যে জল খে'য়ে করে ধড়ফড়।
কাঁপরে ভেকের মধ্যে মরে মনোহর॥
বীরকেতু জলে ডুবি করিল বিচার।
ভেক মধ্যে মরিয়াছে দুষ্ট দুরাচার॥
তুলিয়া রাখিল ভেক সরোবর পাড়ে।
সত্বরে চলিয়া গেল শশী বরাবরে॥
যোড়হাত করি কহে শুনহ বচন।
ভেকতে ঢাকিয়া চোর ত্যজেছে জীবন॥
শশী কহে আন শীঘ্র রাজার গোচরে।
নরহত্যা বাণী পুনঃ না শুনাহ মোরে॥
তাহা শুনি বীরকেতু চলিল সত্বর।
ভেক সহ চোরে দিল রাজার গোচর॥
মরিয়াছে দুরাচার রাজা তুষ্ট মন।
পারিতোষিক বীরকেতু পাইল শিরত্রাণ॥
চারি দণ্ড দিবা যবে গগনেতে ছিল।
হেন কালে এই কার্য্য সংঘটন হৈল॥
দাসীগণে ডাকি রাজা বলিছে বচন।
অন্দরেতে আনি চোরে করাহ দর্শন॥
আজ্ঞামাত্র শব গোটা অন্দরে আনিল।
দেখি নারীগণ সবে বিষাদিত হৈল॥

বনমালায় আদেশিল করিতে বন্ধন।
তাহা শুনি বনমালার বিষাদিত মন ॥

ত্রিপদী

আদেশিলা মহারাজা, মনোহরে কয় তাজা,
ভাল চোর এবে জানা গেল।
শুন রে অসতী নারী, দেখি তোর পাতক ভারি,
তোর হেতু রাজ্যে অমঙ্গল ॥
পাত্রে কহে রাজরাণী, মাতৃসম বেদ বাণী,
তারে হরে যেই দুরাচার।
তাহার খাইলে মাথ, পাত্রগত নাহি দোষ,
ইথে নাহি হবে অবিচার ॥
পুত্র দোষে পিত' দোষী, সেই হেতু আন শশী,
নিজ পুত্রে করুক ভক্ষণ।
কুপুত্র জন্মায় যেই, শাস্ত্র মতে পাপী সেই,
রাজধর্ম্মে দুষ্টের মরণ ॥
হেথা বনমালা রাণী, হ'য়ে অতি বিষাদিনী,
অন্তরেতে ফুকারিয়া কান্দে।
প্রকাশ করিতে নারে, মনে ধৈর্য্য নাহি ধরে,
অশ্রুজলে ভাসে মুখ চান্দে ॥
আনি মনোহরে ডাকি, হইনু পাপের ভাগী,
এই পাপে কি হইবে গতি।
মোরে কেন না বধিল, তাহা তবু ভাল ছিল,
অভাগিনী আমি পাপ মতি ॥
বনমালা কান্দি কয়, আরে বিধি হায় হায়!
কেন এত কৈলা বিড়ম্বন।
আমি নারী পাপিষ্ঠী, মনোহর নির্দোষী
কেন তার বধিলে জীবন ॥

দোষী ছাড়ি অন্য জনে, বধ বিধি অকারণে !
ইহা তোর কেমন বিচার।
শুন শুন প্রাণ সই, চরণে ধরিয়া কই,
হেন কথা কহিব না আর ॥
বনমালা ভাবে দুখ, কিছুতেই নাহি সুখ,
মনে ভাবে গোসানী চরণ।
মনে মনে ভাবে ধনী, যা করুন মা ভবানী,
মনোহরে করিব রন্ধন ॥
বনমালা আদেশিল, তথা যত দাসী ছিল,
কাটিয়া আনহ মনোহরে।
আজ্ঞা পেয়ে দাসীগণ, কাটে শব ততক্ষণ,
আনি দিল রাণীর গোচরে ॥
তাহা দেখি বনমালা, বিষাদে মগন হৈলা,
কান্দিয়া হইল টলমল।
অধর্ম্মেতে হয় নাশ, বুঝ সবে এই ভাষ,
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল ॥

হায় হায় করি রাণী করিয়া ক্রন্দন।
রন্ধন শালেতে গেল করিতে রন্ধন ॥
মনোহরের মাংস সকল করিলেন ভাজা।
যেমত করিতে আদেশিছে মহারাজা ॥
সুবর্ণ অঙ্গুরী ছিল মনোহরের নখে।
সে অঙ্গুরী ভাজে রাণী দাবি ঘৃত পাকে ॥
রন্ধন হইল শেষ রাণী ডাকি কয়।
আজ্ঞা মাত্র গেল দাসী রাজার সভায় ॥
দাসী কহে মহারাজ কর অবধান।
রন্ধন হইল শেষ করহ গমন ॥
রাজা কহে কহ গিয়া পারণ করিতে।
লোক জন সহ আমি যাইব পশ্চাতে ॥
দাসী কহিল গিয়া বনমালার স্থান।
পারণ করহ শীঘ্র আইসে রাজন ॥

হেথা কোতয়াল কহে প্রতি দ্বারে দ্বার।
রাজার বাড়ীতে চল করিতে আহার॥
শশী আদি লোক জন সকলে আসিল।
রাজার সহিত সবে ভোজগৃহে গেল॥
বসিলেন সারি সারি স্থানে নরপতি।
ভোজনের কালে হয় প্রহরেক রাত্রি॥
অন্ন ব্যঞ্জন খেয়ে সকলে তুষ্ট হৈল।
অঙ্গুরী সহিত নথ শশী-পাতে দিল॥
দেখি শশী চমকিয়া করে হায় হায়।
গোসানীর দৈববাণী কভু মিথ্যা নয়।
ভোজন করিয়া সবে বাহির হইল।
মুখ শুদ্ধি করি শেষে নিজগৃহে গেল॥
রাজা সম্ভাষিয়া শশী মাগিল বিদায়।
রাজা আজ্ঞা দিলা শশী গেল নিজালয়॥
সমস্ত রজনী শশী করিল রোদন।
যথার্থ হইল এবে দৈবের বচন॥
ভেক মধ্যে মনোহর ত্যজিবে জীবন।
ভেক নির্ম্মাইতে ইহা করেছি শ্রবণ॥
বিধি মোর নিদারুণ কি করি উপায়।
চণ্ডীর মায়াতে মোর পুত্র মরি যায়॥
ধিক্ ধিক্ হরি মোর এ ছার জীবন।
মনোহর পুত্র শোকে দহে মোর প্রাণ॥
ভূমিতে লোটায়ে শশী করে হায় হায়।
মারিয়া আমার পুত্র আমারে খাওয়ায়॥
যদি হ'য়ে থাকে মোর পুত্র দুরাচার।
বধুক তাহারে রাজা শাস্ত্রের বিচার॥
খাইবার ইচ্ছা যদি হ'য়ে থাকে তার।
আপনি উদর পূরি করুক আহার॥
মোরে কেন খাওয়াইল পুত্র আপনার।
মহাপাপী হয় বটে আমার কুমার॥

ততোধিক মহাপাপী হয় কান্তেশ্বর।
এমন রাজার কার্য্য না করিব আর॥
প্রভাতে উঠিয়া শশী স্নান দান কৈল।
ভাবিয়া চণ্ডীকাপদ দক্ষিণে চলিল॥
হেথা শশী পাত্র বলি হৈল গণ্ডগোল।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল॥

প্রভাতে উঠিয়া রাজা করি স্নান দান।
বাহির উদ্যানে আসি কৈল অধিষ্ঠান॥
রাজা কহে কোতয়াল যাহ ত্বরা করি।
কোথা আছে শশীপাত্র শীঘ্র আন ধরি॥
আজ্ঞামাত্র কোতয়াল করিল গমন।
শশীর গৃহেতে আসি দিল দরশন॥
শশীবর শশীবর কোতাল ডাকিল।
কোথা গেছে শশীবর দেখা না পাইল॥
কোতয়াল কহে গিয়া রাজ বিদ্যমান।
দেখা না পাইনু শশী করিয়া সন্ধান॥
চমৎকৃত হইল রাজা হেন বাক্য শুনি।
বিপদ ঘটায় বুঝি শশী মহাজ্ঞানী॥
পরয়ানা জাহির করি হাটে ঢোল দেয়।
আজি যদি শশীবর হাজির না হয়॥
কার্য্যচ্যুত হইবেক আর হবে সাজা।
ত্বরায় হাজির হবে আদেশিলা রাজা॥
নিরুদ্দেশ হইল পাত্র কহে সর্ব্বজন।
কহিল আসিয়া সবে রাজ বিদ্যমান॥
এতেক শুনিয়া রাজা মনেতে ভাবিয়া।
বীরকেতু চৌকিদারে আনে ডাক দিয়া॥
যোড় হস্তে কহে বীরকেতু মহাবীর।
আজ্ঞা কর মহারাজ অধীন হাজির॥
কোথা গেল শশীপাত্র না পাই উদ্দেশ।
সন্ধান জানিয়া তুমি বল সবিশেষ॥

মন্ত্রী বিনা কোন মতে রাজ্য রক্ষা নয়।
মন্ত্রী যোগ্য বট তুমি মোর মনে লয়॥
আনন্দে স্বীকৃত হ'ল বীরকেতু বীর।
সেই ক্ষণে মন্ত্রী তারে করে কান্তেশ্বর॥
হেন মতে মন্ত্রী হৈল বীরকেতু বীর।
পালিল বেহার রাজ্য নির্ভয় শরীর॥
এইরূপে কত দিন কৌতুকেতে গেল।
এক দিন মন্ত্রীবরে রাজা আদেশিল॥
রাজা কহে শুন মন্ত্রী! আমার বচন।
পশ্চিমে আঠারকোঠায় আছে বহু ধন॥
গড়েতে লাগায়ে গড় বান্ধ এক গোটা।
সেই গড় দিয়া ঘের অষ্টাদশ কোঠা॥
আঠার কোঠার গড় লও জয়েশ্বরে।
ধর্মপাল বানেশ্বর আর কোটেশ্বরে॥
ঘোড়াঘাট রঙ্গপুর বৌদার অর্দ্ধখান।
জয়েশ্বর যাও পুনঃ হ'য়ে সাবধান॥
এত শুনি বীরকেতু নমস্কার কৈল।
গড় বান্ধিবারে পাত্র তখনি চলিল॥
সৈন্য সামন্ত কৃষাণ ধরি সমভারে যায়।
গড়েতে লাগায়ে গড় বান্ধিল ত্বরায়॥
হেথা শশীপাত্র যায় কান্দিতে কান্দিতে।
এক পাঠানের সহ দেখা হইল পথে॥
কহে সে পাঠান, কেন করিছ ক্রন্দন।
কোন্ দেশে ঘর তব কহ বিবরণ॥
তোমার ক্রন্দনে মম দ্রব হয় মন।
ভদ্রলোক প্রায় দেখি দুঃখী কেন মন॥
এত শুনি শশীপাত্র কহিতে লাগিল।
দৈবের বিপাকে ভাই বিধি বিড়ম্বিল॥
উত্তরে বেহার রাজ্য ঘোষে সর্ব্বজন।
ভূপতি তাহার বটে নামে কান্তেশ্বর॥

তার মন্ত্রী হই আমি শশী মোর নাম।
দৈবের নির্ব্বন্ধে মোর বিধি হৈল বাম॥
শতনারী আছে রাজার পরমা সুন্দরী।
এক মুখে তার রূপ বর্ণিবারে নারি॥
তার মধ্যে বনমালা হয় পাটেশ্বরী।
যাহার রূপেতে মুগ্ধ রাজ্য অধিকারী॥
তারে উপহাস করে পুত্র মনোহর।
সেই হেতু বধে তারে রাজ্যের ঈশ্বর॥
দুরাচার জানি তারে বধিল রাজন।
ছলে পুত্রমাংস মোরে করালে ভক্ষণ॥
দুষ্ট পুত্রে খাউক রাজা তাতে ক্ষতি নাই।
মোরে খাওয়াইল কেন ভাবি আমি তাই॥
এই দুঃখে মোর প্রাণ দহে অনুক্ষণ।
সে কারণে কান্দি তাই করি নিবেদন॥
যেই জন করিবেক এর প্রতিকার।
সেই মোর ধর্ম্মপিতা আমি দাস তার॥
শশীর নিষ্ঠুর বাণী পাঠান শুনিল।
চিন্তা না করহ তাই পাঠান বলিল॥
পশ্চিম রাজ্যেতে আছে লক্ষন[১] সহর।
সে রাজ্যের নবাবের আমি যে নফর[২]॥
নবাব শুনেন যদি এ সকল কথা।
বধিবে তাহারে তিনি না হবে অন্যথা॥
হেন শুনি শশীধর আনন্দিত হৈল।
চল তথা যাই বলি সেলাম করিল॥
পাঠানের সঙ্গে করে পশ্চিমে গমন।
লক্ষ্ণৌ[১] সহরেতে গিয়া দিল দরশন॥
সেলাম করিল শশী পাঠান সহিত।
শশীকে দেখিয়া নবাব হৈল চমকিত॥

---

১ লক্ষ্মণাবতী; গৌড়।

২ ভৃত্য।

কি নাম তোমার বল কোথা তব ঘর।
কি হেতু আইলা কহ আমার গোচর॥
এ কথা শুনিয়া শশী করে হাত যোড়।
বলিল সমস্ত কথা নবাব গোচর॥
যেই মতে চণ্ডী-বরে রাজা কান্তেশ্বর।
যেমতে আসিয়া শশী হৈল পাত্রবর॥
সুবর্ণেতে পূর্ণ কোঠা যেমতে হইল।
যে প্রকারে মনোহর তনয় মরিল॥
যেমতেতে মনোহরে খাইল রাজন।
যে ছলেতে পুত্রমাংস করালে ভোজন॥
সব দুঃখ নিবেদিল নবাব গোচর।
হাজার হাজার সেলাম করে অতঃপর॥
সহচর পাঠান কহিল আর বার।
বেহারে আছেন রাজা নামে কান্তেশ্বর॥
লুটিয়াছে সেই ভূপ এর ঘর দ্বার।
নবাব সাহেব এরে করহ উদ্ধার॥
বধ করি পুত্র এর ইহারে খাওয়ায়।
হেন অবিচার দেখ কোন্ রাজ্যে হয়॥
নর মাংস খায় যবে নবাব শুনিল।
সাজিতে সৈনিকগণে আদেশ করিল॥
মোগল পাঠান সেনা করহ সাজন।
লড়াই করিতে যাব বেহার ভুবন॥
নবাব আদেশ দিল সেনানী সাজিল।
বন্দুক কামান আদি সব অস্ত্র নিল॥
অসংখ্য আসিল চলি মোগল পাঠান।
জল্পেশ্বরে আসি কৈল শিবির স্থাপন॥
জল্পেশ্বরের মঠ দেখি নবাব কহিল।
কোন্ দেবতার মঠ কে ইহা বান্ধিল॥
শশী বলে এই মঠে দেব জল্পেশ্বর।
স্থাপন করিল ইহা রাজা কান্তেশ্বর॥

ভূপতির পশ্চিম সীমার এই ভূমি।
বিপক্ষের রাজ্যে সাহেব আনিয়াছ তুমি ॥
এত শুনি আনন্দিত হইল নবাব।
দেখি গিয়া জল্পেশ্বরের কেমন প্রভাব ॥
নবাব দেখিতে গেল মঠের দুয়ার।
ম্লেচ্ছ ভয়ে ব্যস্ত হ'ল দেব মহেশ্বর ॥
মঠ মধ্যে অন্তর্দ্ধান হৈল শূলপাণি।
হেন কালে আকাশেতে হৈল দৈববাণী ॥
শুন শুন সর্ব্বজন শুন দৈববাণী।
মঠ মধ্যে লুকাইছে দেব শূলপাণি ॥
শিব নাই এর মধ্যে না করিহ জ্ঞান।
মঠেতে পূজিলে শিবে হ'য়ে ভক্তিমান ॥
অবশ্যই বাঞ্ছা সিদ্ধ তাহার হইবে।
ইহাতে মরিলে লোক শিবলোক পাবে ॥
হেন মতে মহেশ্বর অন্তর্দ্ধান হৈল।
জল্পেশ্বরে না দেখিয়া নবাব ফিরিল ॥
ক্রোধিত হইল নবাব অগ্নির সমান।
ভাঙ্গহ মঠের চূড়া পূরিয়া কামান ॥
নবাবের আজ্ঞা পেয়ে মোগল পাঠান।
কামানেতে অগ্নি দিল করিয়া সন্ধান ॥
লক্ষ গোটা তোপে অগ্নি দেয় একবারে।
তোপের গোলার চোটে চূড়া ভাঙ্গি পড়ে ॥
গুলিবেগে চূড়া গোটা পরে অন্যস্থান।
চূড়াভাণ্ডার বলিয়া হৈল তার নাম ॥
মঠের ভাঙ্গিয়া চূড়া পবনে উড়িল।
গোলার চোটে মঠের দক্ষিণ ভাঙ্গিল ॥
মঠ হইল ভগ্ন বাদলে জল ঝরে।
অদ্যাবধি শিবরাত্রে তাহে পূজা করে ॥
শিবের মায়াতে স্থির নহে কোন জন।
মঠ ছুইতে না পারিল নবাব যবন ॥

তথা রহে সৈন্যগণ করি কোলাহল।
ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গল॥

প্রাতঃকালে ত্যজি শয্যা নবাব যবন॥
শশীপাত্র সঙ্গে করি করিল গমন॥
আইল আঠার কোঠা যত সেনাগণ।
দেখিল কোঠার গড় বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নবাব কহিল কথা শশী বরাবরে।
কিসে পূর্ণ কোঠা সব যেবা যাহা গড়ে॥
কহিলেন শশীপাত্র নবাব সদনে।
অষ্টাদশ কোঠা পূর্ণ রজত কাঞ্চনে॥
কান্তেশ্বর রাজার আছে যত মোহর।
সমুদয় আছে হেথা কোঠার ভিতর॥
সুবর্ণ মণ্ডিত হস্তী আছে এক গোটা।
তাহার রক্ষণে আছে এ আঠার কোঠা॥
নবাব শুনিয়া ইহা আদেশ করিল।
আজ্ঞা মাত্র সেনাগণ ভাণ্ডার বেষ্টিল॥
দেখিলেক কোঠা সব সোগল অপার।
প্রাণ লয়ে পলাইল রক্ষক তাহার॥
খাল কাটি হাতী রাখি মাহুত পলায়।
হাতীধুসা খাল বলি অদ্যাবধি কয়॥
বেষ্টন করিয়া কোঠা পাঠান মোগল।
মহামূল্য রত্নরাজি লুটিল সকল॥
তথা হৈতে সৈন্যগণ করিয়া গমন।
জয় দুয়ারেতে আসি দিল দরশন॥
বীরকেতু বীর শুনি সৈন্য আগমন।
ভয়েতে কম্পিত হৈল শুকাল বদন॥
দিবা অবসানে সৈন্য ছাউনী করিল।
পরিশ্রান্ত হ'য়ে নিশি তথায় যাপিল॥

হেথা বীরকেতু রাত্রে পরামর্শ ক'রে।
যতেক মজুর লোক আনিলেক ধ'রে॥

কর্ম্মিগণ কহে পাত্র শুনহ উত্তর।
রাত্রিতে আঠার কোঠা ঘের দিয়া গড়॥

কর্ম্মিগণে কহে শুন মন্ত্রী মহাশয়।
হেন অসম্ভব কর্ম্ম এক রাত্রে নয়॥

এক পক্ষ কর্ম্ম করি বান্ধিল যে গড়।
রাত্রি মধ্যে করা তাহা বড়ই দুষ্কর॥

বীরকেতু পাত্র কহে শুনহ কৃষাণ[1]।
নিশা মধ্যে হবে শেষ করিতে নির্ম্মাণ॥

ধরিতে তোদেক চেষ্টা করিবে সেনানী।
সবে হবে সাবধান আপনা আপনি॥

ইহা বলি বীরকেতু গেল নিজপুরে।
যতনে বান্ধয়ে গড় যতেক মজুরে॥

প্রভাতে উঠিয়া কহে নবাব শশীরে।
বান্ধিয়াছে এই গড় কাহার মজুরে॥

শশী কহে নবাব করহ অবধান।
নির্ম্মায়েছে এই গড় রাজার কৃষাণ॥

শুনিল আঠার কোঠা যাবে এই গড়।
আদেশ করিল নবাব ভাঙ্গহ সত্বর॥

হেন শুনি নবাবের যত সেনাগণ।

ত্বরা করি যায় সবে ধরিতে কৃষাণ॥

কৃষাণ ধরিতে যায় মোগল পাঠান।
তাহা দেখি কৃষাণ করয়ে পলায়ন॥

মোগলের ভয়েতে কৃষাণ পলাইল।
সে কারণে নাম তার বাহিরগড়[2] হৈল॥

সে স্থান হইতে নবাব গমন করিল।
শিলদুয়ারেতে[3] আসি উপনীত হৈল॥

---

১ দিনমজুর > কিষাণ।

২ রাজধানীর বহির্দেশে যে মাটির প্রশস্ত প্রাচীর আজিও বর্তমান তাহাই বাহিরগড়। মাঝে মাঝে ভগ্ন।

৩ মন্দির হইতে প্রায় ১৫ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল গড়ের দক্ষিণ দুয়ার। এই প্রবেশ পথেরই নাম শিলদুয়ার। বর্তমানে শিঙ্গিমারী নদীগর্ভে বিলুপ্ত।

নবাব কহেন শশী অবধান কর।
গড়ের দক্ষিণ দ্বার কি নাম উহার॥
শশী কহে ইহার নাম শিলদুয়ার।
শিলের কপাট ঐ শিলে বান্ধা দ্বার॥
চারিদিকে চারি দ্বার পরম সুন্দর।
দ্বারে প্রবেশিতে নাহি পারে কোন নর॥
গড়ের ভিতরে আছে রাজা কান্তেশ্বর।
কি মতে তাহার সঙ্গে করিবা সমর॥
সম্মুখে দেখহ ব্যূহে আছে সেনাগণ।
এখান হইতে সাহেব হবে সাবধান॥
ক্রোধিত হইল নবাব এতেক শুনিয়া।
আদেশ করিল দ্বার ফেলহ ভাঙ্গিয়া॥
কামানে পূরিয়া গোলা ফায়ার করিল।
গোলাঘাতে শিলদ্বার ভগ্ন হ'য়ে গেল॥
বন্দুকের দুড় দুড়ি মহাশব্দ হয়।
ছাউনী ভাঙ্গিয়া সৈন্য সকল পলায়॥
ঘোরতর যুদ্ধ করে মোগল পাঠান।
হস্ত পদ কাটে আর কাটে নাক কাণ॥
এইরূপে সৈন্য কাটে নবাব আদেশে।
নাককাটা নাককাটি অদ্যাবধি ঘোষে॥
ভোলানাথের দিঘী[1] বলি পশ্চিমেতে ধায়।
পাষাণের গৌরীপাট ভাঙ্গিয়া ফেলায়॥
পাটেরে ভাঙ্গিয়া লুঠে সহরের ধন।
ঈশান কোণেতে পুনঃ করিল গমন॥
মহাক্রোধে ধায় মোগল করি ধর মার।
সৈন্য সেনা মারি পুনঃ আইল পূর্ব্ব দ্বার॥
উচ্ছন্ন হইল দ্বার সকলি পলায়।
তথা হৈতে সৈন্যগণ দক্ষিণেতে ধায়॥

---

১ রাজা কান্তেশ্বরের বাস বাংলা কাছারী বাড়ি সংলগ্ন পুকুরই ভোলানাথের দীঘি বলিয়া খ্যাত। মন্দির হইতে প্রায় ৫ কি. মি. দূরত্ব।

বিদ্যাধর নামে আছে এক সদাগর।
তাহার বাড়ীর কাছে আছয়ে সহর ॥
মহাধনবান সাধু জাতিতে সে তিনি।
কান্তেশ্বরের দেশে সে করে সাউদালী[1] ॥
নির্ম্মল স্ফটিক সম তার সরোবর।
সাউদালীর দিঘী বলি ঘোষে সর্ব্বনর ॥
সাউদালীর হাট ঘাট মোগল লুঠিল।
বিদ্যাধর সাউদ ভয়ে পলাইয়া গেল ॥
ভৈরব নামেতে তাঁতি জাতিতে সে যুগী।
তাঁতি কাজ করে কিন্তু সতত বৈরাগী ॥
রাজার যোগায় বস্ত্র রাজা ভালবাসে।
দেখি সেনাগণ তারে ভোলা বলি হাসে ॥
তাজি কেলে তাঁত খোঁট ভৈরব রুষিল।
খুঁটা হস্তে করি তাঁতি যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
ভাঙ্গিল তাঁতির খুঁট কুঠার লইল।
কুঠার আঘাতে কত মোগল কাটিল ॥
ম্লেচ্ছেরে কাটিল বলি পাপে করি ভয়।
ত্যাজিয়া কুঠার খানি পূর্ব্ব মুখে ধায় ॥
যোগ আরম্ভিল তাঁতি করি একমন।
যোগীদুর্গা নাম তার বলে সর্ব্বজন।
মোগলের সৈন্যগণ যথা পড়ে কাটা।
সে কারণে তার নাম হইল মোগলকাটা[2] ॥

---

১ সাধু>সাউধ (অপিনিহিতি)>সাউদ (স্থানীয় উচ্চারণ)+আলী।

২ মোগলকাটা—মন্দির হইতে আনুমানিক ৪.৫ কি. মি. উত্তরে কাকিনা-কোচবিহার রাস্তার উপরে অবস্থিত। হোসেন শাহের সহিত কান্তনাথের যুদ্ধের সময় পাঠান সৈন্যগণ এইস্থানে আশ্রয় নেয়। তৎকালে মোগল-পাঠানে বিশেষ তফাৎ বুঝিতে না পারিয়া পাঠানরা এখানে প্রচলিতভাবে মোগল হইয়াছে। যুদ্ধে কান্তনাথের সেনাপতি বীরভদ্র প্রবল পরাক্রমে সৈন্য বিনষ্ট করায় ঐ স্থানের নাম "মোগলকাটা" হয়। বর্ত্তমানে জলাশয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। তবে ফাল্গুন-চৈত্র মাসের দিকে দুর্গের ভগ্নাবশেষ জলে ডুব দিয়া ধরা যায়। এক সময়ে এই জলাশয়ের উৎপত্তি, বর্ত্তমানে এই বিলটির নাম মোগলকাটা বিল। মোগলকাটা নামটি অন্যত্রও দেখা যায়।

ক্রোধে অগ্নি সম হ'য়ে যুঝিছে পাঠান।
বার বাঙ্গালায়[১] আসি দিল দরশন॥
তথাকার যত ধন সকলি লুঠিল।
বাজার সোয়ারী ল'য়ে সৈন্য পলাইল॥
যতেক সোয়ারী ছিল রাখে একস্থান।
সোয়ারীগঞ্জ বলি হইল তার নাম॥
মহাক্রোধে দুই মাল[২] দক্ষিণে চলিল।
ধরিবারে মালগণে পাঠান ছুটিল॥
মাল গাড়ি দুই মাল ঊর্দ্ধ মুখে ধায়।
সে কারণে মালগাড়া নাম তার কয়॥
যেখানে পলায়ে গেল সাউদ বিদ্যাধর।
তথা গিয়া উপনীত হ'ল মালবর॥
সিদলের গোলা মধ্যে হইল গণ্ডগোল।
কর্দ্দম করিল খুচি শুকটা[৩] সিদল[৪]॥
শীতল খুচী বলি তাহার নাম হৈল।
এইরূপে দুই মাল যুঝিতে লাগিল॥
মাল সঙ্গে সদাগর দেখা না পাইয়া।
সত্তের দুয়ারে পুনঃ আইল চলিয়া॥
দেখা কহিছে যোগল কোথা কান্তেশ্বর।
থানা বাড়ী মধ্যে আছে কহে শশীবর॥
কান্তেশ্বর শুনিল পুরে যোগল আইল।
মহারাজা কান্তেশ্বর কহিতে লাগিল॥
রাবণের ভাই হয় রাজা বিভীষণ।
সে যাইয়া লইল শ্রীরামের শরণ॥
সবংশে রাবণ রাজায় বধিল শ্রীরাম।
বধিল রাবণ রাজায় পূরে মনস্কাম॥

---

১ রাজা কান্তেশ্বরের কাছারী বাড়ি। বারটি ঘরের সমাহার; কিন্তু দূরত তাহাদিগকে একটি ঘর বলিয়া বোধ হইত।

২ মল্ল যোদ্ধা।

৩ শুকনা মাছ।

৪ শুকনা মাছ গুড়া করিয়া বিভিন্ন দ্রব্য সহকারে প্রস্তুত করা এক প্রকার খাদ্য।

ঘরভেদেরে রাবণ নষ্ট আপন দোষে রাণী।
কি কহিব পর কথা আপন দ্বেষীপিনী॥
সেই শশী লইল নবাবের স্মরণ।
তেঁই হেথা আসিয়াছে ম্লেচ্ছ যবন॥
ওরে শশী আমি তোরে আর বলিব কি।
প্রাণে যদি জীয়ে থাকি দেখা যাবে ফাকি॥
ধর মার শুনে রাজা ভাবিছে অন্তরে।
পুরুষ হইয়া নবাব আসে পিছু দ্বারে॥
নারীর মতন রাজা অস্ত্র ত্যিয়ু কর্ম্ম।
ইহার সনে যুদ্ধ করা রাজার নহে ধর্ম্ম॥
শ্রীদুর্গা বলিয়া রাজা বসিয়া রহিল।
মোগলে রাজার পুরী উচ্ছন্ন করিল॥
যাকে যেথা দেখে মোগল পাঠান।
খাঁড়ার আঘাতে তার বধিছে পরাণ॥
হেন মতে কান্তেশ্বর যুদ্ধ না করিল।
মোগল পাঠান যেয়ে রাজাকে ধরিল॥
ধরি রাখে মহারাজে লোহার পিঞ্জরে।
মনে মনে কান্তনাথ দুর্গানাম স্মরে॥

পাট মধ্যে মোগল রাজাকে ধরিয়া।
সীতল আওয়াস বলি চলিল ধাইয়া॥
বনমালা সহ তথা শত রাণী রয়।
মোগল ছুইবা মাত্র পাষাণ হয়ে যায়॥
নবাব দেখিল রাণী পাষাণ হইল।
কপালে মারিয়া চড় হায় হায় কৈল॥
স্বধর্ম্মনজানা রাণী শত জন হয়।
শিব অঙ্গ শিব জানি শিলা সম হয়॥
পাঁচ কন্যা বলি তায় ঘোষে সর্ব্বজন।
তার পূজা করে নর সিদ্ধির কারণ॥

পাঁপিড়ায় অন্ন দেয় পক্ষী দেয় পানী।
এইত কারণে রাজার শরীরে আছে প্রাণী ॥
নবাব শুনিল যদি এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া মনে ভাবিছে তখন ॥
পাঞ্জরায় জল দেয় তাহাকে মারিল।
পাঁপিড়ায় চাউল দেয় কাড়িয়া লইল ॥
হেন মতে কান্তেশ্বরে কত কষ্ট দিল।
তথাপি যবন প্রাণে দয়া না জন্মিল ॥
কান্তেশ্বর কহে কথা নবাব গোচর।
তোষিব আপন কথা তোকে কিবা ডর ॥
সাত দিন গত হয় কিছু নাহি খাই।
স্নান করিবারে দেও নবাবের ভাই ।
স্নান করিবারে চাই শুন রে বচন।
পিতৃলোকের যে মুই করিব তর্পণ ॥
আগে পাছে মরিব যে শুন মহাশয়।
পিতৃলোক নষ্ট হয় এই লাগে ভয় ॥
এত শুনি নবাবের সদয় হইল মন।
স্নান করিবারে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ।
নবাবের আজ্ঞা পে'য়ে জলেতে নামিল।
খালি পিঞ্জরটি তীরে পড়িয়া রহিল ॥
জলেতে নামিয়া রাজা করেন তর্পণ।
এক মনে ভাবে রাজা গোসানীর চরণ ॥
হেন কালে রাজা শুনে আকাশিয়া বাণী।
মন স্থির কর রাজা কহিছে ভবানী ॥
জলে ডুব দেও বাপু কান্তেশ্বর রাজা।
কাজিলী কুড়ায় মঠে মোর কর পূজা ॥
শ্রীদুর্গা বলিয়া রাজা জলে ডুব দিল।
জলমধ্যে মঠে যেয়ে গোসানী দেখিল ॥
দরশন পেয়ে রাজা বন্দিল চরণ।
আপনার কথা কহে গোসানী সদন ॥

গোলক হইল রাজা কাজিলী কূড়ায়।
জলের মধ্যেতে মঠ দেখা নাহি যায়॥
ডুবে রাজা কান্তেশ্বর কেহ না দেখিল।
নবাব ভাবেন মনে কুম্ভীরে খাইল॥
নবাব কহিল শশী মোর সঙ্গে চল।
পালন করিব তোরে দিব অন্ন জল॥
চলিল নবাবসেনা কোলাহল করি।
রাজাকে করিল রক্ষা মাতা কান্তেশ্বরী॥
পশ্চিম মুখেতে যায় মোগল পাঠান।
লুট পাট করি রাজ্য করিল উচ্ছন্ন॥
মোগলের সঙ্গে শশী করিল গমন।
জাতি কুল গেল তার হইল যবন॥
জাতি কুল গেল তার আর ধন জন।
মনের আগুনে শশী করিছে ক্রন্দন॥
পিঞ্জিরা সঙ্গেতে ছিল ফেলাইয়া দিল।
পিঞ্জিরার ঝাড় বলি তার নাম হৈল॥
গোলক হইল রাজা কাজিলী কূড়ায়।
রাজার বিহনে প্রজা কত দুঃখ পায়॥
নগর উৎসন্ন হৈল প্রজা পলাইল।
মহাকষ্টে সব লোক কান্দিতে লাগিল।
গোসানীর পূজা বন্ধ পূজারী বিহনে।
হেন মতে অরাজক হৈল কত দিনে॥
হইল আকাশ বাণী শুন সর্ব্ব নর।
এই রাজ্যে হবে রাজা নাহি কোন ডর॥
শিবের ঔরসে রাজা হইবে বেহারে।
পূজা হবে এই স্থানে জানিবা আমারে॥
আকাশী বচন শুনি যত প্রজাগণ।
হইল সুস্থির আর পূজারী ব্রাহ্মণ॥
এইরূপে অরাজক কত দিন গেল।
শিব অংশে পুনঃ রাজা বেহারে হইল॥

বেহারে হৈল রাজা আপনি ভোলানাথ।
রাজার ধর্ম্ম হেতু প্রজায় পায় ভাত॥
বেহারে হইল রাজা বড় ধর্ম্মশীল।
গোসানীর পূর্ব্ব দেউরী স্থির করি দিল॥
কত কত ভূমি দিল পূজা করিবার।
অসংখ্য ছাগ মহিষ বলি আনিবার॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক হইলেক সুখী।
রামরাজ্য সম রাজ্য নাহি কেহ দুঃখী॥
ঘরে ঘরে সুমঙ্গল করে সর্ব্বক্ষণ।
হেন মতে সুখে রয় যত প্রজাগণ॥
গোসানী-মঙ্গল গীত শুনে যেই জন।
গোসানীর বরে সেই পায় ধন জন॥
গোসানী ঠাকুরাণী যার দিকে চায়।
ধন জন পুত্রে সে আনন্দে বেড়ায়॥
গোসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ।
হরি ভজ ওরে মন গুরু পদে আশ॥
ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস।
অবশ্য গোসানী তারে করিবেক নাশ॥
নির্ব্বংশ হইবে সে গোসানীর কোপে।
দরিদ্র হইবে সেই গোসানীর শাপে॥
পাঁচালী লিখিয়া হয় মনের উল্লাস।
গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধাকৃষ্ণ দাস॥
গোসানীর নামে ভাই না করিও হেলা।
নৌকার বিহনে যাও সাগরে বান্ধি ভেলা॥
গোসানী-মঙ্গল নাম তরী অনুপম।
স্মরণ লইলে তার সিদ্ধ হয় কাম॥
গোসানী আদেশে ভাই ভজ হরি পায়।
গোসানী-মঙ্গল গীত রাধাকৃষ্ণ গায়॥

———

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

কমতেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্দির

রাজা কান্তেশ্বরের তিরোধানের পর এই রাজ্য কিছু কাল অরাজক অবস্থায় থাকে। তৎপর কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ বিশ্বসিংহ প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু তিনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ না করিয়া প্রথমতঃ স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চন্দনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দন লোকান্তর গমন করিলে পর তিনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই বংশের ষষ্ঠ ভূপতি খ্যাত-নামা মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময় গোসানীমারিতে গোসানীর বর্ত্তমান-মন্দির নির্ম্মিত ও দেবী কান্তেশ্বরী পুনঃ প্রতিষ্ঠিতা হন।[1]

গোসানী-মঙ্গলে উল্লিখিত আছে যে মোগল আক্রমণ সময় দেবীকে কাজিলী-কুড়ায় বিসর্জ্জন করা হয়। মহারাজ প্রাণনারায়ণ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মহামায়াকে বর্ত্তমান স্থানে সংস্থাপন করেন। এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে কবচরূপিণী দেবী ভূনা নামক একজন ধীবরের জালে আবদ্ধ হইয়া স্বপ্নে এইরূপ আদেশ করেন যে, "আমাকে কাজিলীকুড়া হইতে উদ্ধার করিয়া পাটহস্তীর পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন করিতে হইবে; হস্তী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গমন করতঃ যে স্থানে দণ্ডায়মান হইবে তথায় আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" উক্ত নির্দ্দেশানুসারে ১৫৮৭ শকে গোসানীমারিতে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের দ্বারদেশে প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক লিখিত হয়।

সম্বত্যা বিষদেক জিষর ভূজ দণ্ডপ্রতাপার্য্যায়।
ক্রীড়াকন্দুক বেগবর্দ্ধিত যশঃ শ্রীপ্রাণভূমিপতেঃ॥
শকাব্দে নগনাগ মার্গণমিত জ্যোতির্ম্মিতে নির্ম্মিতঃ।
শ্রীভাজা কবিমণ্ডলেন ভবতা ভব্যো ভবানীমঠঃ॥

মৈথিল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার কার্য্য করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ঐ সময় মৈথিল ব্রাহ্মণ পাওয়া নিতান্ত সুলভ ছিল না। ঘটনাক্রমে তৎকালে

---

১ বিগত ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবারের প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরের অনেক অংশ নষ্ট হইয়াছে।

রতিনাথ ঝা নামক একজন সাধক মৈথিল ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটনোপলক্ষে কামরূপ-পীঠে[1] অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজের অনুচরবর্গ তাঁহাকে গোসানীর পূজারীর কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি প্রথমতঃ উক্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। পরে কি ভাবিয়া বলা যায় না আপনা হইতেই এখানে আসিয়া দেবীর অর্চ্চনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। সাধক রতিনাথ ঝা সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জন প্রবাদ এইরূপ যে "মহামায়া তাঁহার সঙ্গীত প্রভাবে মুগ্ধা হইয়া রজনীতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিতেন।" এই কথা ক্রমশঃ মহারাজের কর্ণগোচর হয়, মহারাজ এতৎশ্রবণে রতিনাথ ঝাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে দেবীর চরণদর্শনের

---

১ এই সময় কামাখ্যার মন্দির কোচবিহারের মহারাজার অধীন ছিল। কালাপাহাড় কর্ত্তৃক কামাখ্যার মন্দির ভগ্ন হইলে মহারাজ নরনারায়ণ বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেবার্চ্চনার জন্য বহুতর দেবোত্তর প্রদান করেন। মন্দিরের দ্বারদেশে মহারাজ নরনারায়ণ ও তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান আছে। মন্দিরে নিম্নলিখিত দুইটি সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে।

(১) লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থোধনুর্ব্বিদ্যয়া।
দানেনাপি দধীচিকর্ণসদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ॥
নানাশাস্ত্র বিচার চারুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ।
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবনৃপঃ॥

(২) তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্র মৌলিস্থলী।
মাণিক্যং ভজমান কল্পবিটপী নীলাচলে মঞ্জুলং॥
প্রাসাদং মুনিবাণ বেদশশভৃচ্ছাকে শিলারাজিভি।
দৈবী ভক্তিমতাং বরো রচিতবান্ শ্রীপূর্ব্ব শুক্লধ্বজঃ॥

মহারাজ যুদ্ধ বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন, বোধ হয় এই জন্যই ইঁহার অপর নাম মল্লনারায়ণ বা মল্লদেব হইয়া থাকিবে। নরনারায়ণ হইতে এই বংশের রাজগণ নারায়ণ উপাধি লাভ করিয়াছেন। কামাখ্যা তন্ত্রমতে বিশ্বসিংহ হইতে মোদনারায়ণ পর্য্যন্ত ছয় জন ভূপতি শিববংশ সম্ভূত। এতৎ সম্বন্ধে কামাখ্যাতন্ত্রে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নর বীরপ্র মকারাখ্যা বিশোর্ব্বংশ বিমণ্ডিতি।
অত্রূপরঃ মহেশানি ভূপষট্কং শাম্ভবেশ্বরীং॥

নরনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বীরনারায়ণ, প্রাণনারায়ণ, মোদনারায়ণ, ইঁহারা ক্রমে পিতৃ-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতঃপর যিনি রাজা হইয়াছেন তাহা তাঁহার পিতৃরাজ্য নহে।

অভিলাষ প্রকাশ করেন। রতিনাথ ঝা এই কার্য্য নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া প্রথমতঃ অস্বীকৃত হন, কিন্তু রাজাদেশ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া গোপনে মহারাজের অভিলাষ পূর্ণ করেন। অন্তর্যামিনী মহামায়া সমস্ত জানিতে পারিয়া মহারাজার প্রতি এই অভিসম্পাত করেন যে, "অদ্যাবধি তোমার বংশের কেহ আমাকে দর্শন করিতে পারিবে না এবং রতিনাথ ঝার বংশ থাকিবে না।" ফলতঃ রতিনাথ ঝার প্রকৃত বংশধর এখন কেহ নাই। এই ঘটনার পর হইতে কোচবিহারের মহারাজগণ কেহই গোসানীমারিতে পদার্পণ করেন নাই। কেবল স্বর্গীয় মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জলপথে এখানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও দেবী দর্শন বা বাটীর ভিতর প্রবেশ করেন নাই। ঘটনাক্রমে নৌকার মধ্য হইতে মন্দিরের চূড়ামাত্র দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এখান হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া আর অধিক কাল জীবিত ছিলেন না।

দেবীর পরিচারকদিগকে দেউরী বলে এবং সেবাইত বা পূজক, বড় দেউরী নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বড় দেউরীর অধীনে পৃথক্ পূজারীর দ্বারা পূজার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দেবীর সেবার নিমিত্ত যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দেবোত্তর ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তৎপরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেউরী ও বাজুকরদিগের পৃথক জায়গীর নির্দ্দিষ্ট আছে। বড় দেউরী রাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত; তিনিও সরকার হইতে যথেষ্ট ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রতি অভিসম্পাতের পর হইতে কবচ একটী রজত কৌটায় আবদ্ধ আছে, তাহা কাহারও দেখিবার অধিকার নাই। উল্লিখিত কৌটার উপরে গালা করা ও তদুপরি ভগবতী মূর্ত্তি অঙ্কিত করা আছে। প্রতি বৈশাখ মাসে দেবীর দর্শন মানসে এখানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের অবগুণ্ঠন রাখিবার প্রথা নাই। পৌষ সংক্রান্তি হইতে মাঘ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রত্যহ অরুণোদয় পূজা হইয়া থাকে। বৃহৎ পর্ব্বাদিতে থালির দ্বারা ভোগ হয়। প্রত্যহ একটি করিয়া পাঁটা বলি হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও সংক্রান্তি এবং পক্ষান্তে দুইটি করিয়া বলি হয়। এতদ্ব্যতীত শারদীয়া পূজা, দীপান্বিতা, রটন্তী দোল, বাসন্তী, বিষুব সংক্রান্তি এবং অম্বুবাচী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে সমধিক পরিমাণে ব্যয় বিধানের ব্যবস্থা আছে।

কোচবিহারের রাজবংশ

	রাজার নাম	রাজ্যাভিষেক সময়	রাজত্বকাল
১।	চন্দন	১৫১০ খ্রীঃ	১৩ বৎসর
২।	বিশ্বসিংহ (বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)	১৫২৩ "	৩১ "
৩।	নরনারায়ণ (পুত্র)	১৫৫৪ "	৩৪ "
৪।	লক্ষ্মীনারায়ণ (পুত্র)	১৫৮৮ "	৩৩ "
৫।	বীরনারায়ণ (পুত্র)	১৬২১ "	৫ "
৬।	প্রাণনারায়ণ (পুত্র)	১৬২৬ "	৩৯ "
৭।	মোদনারায়ণ (পুত্র)	১৬৬৫ "	১৫ "
৮।	বাসুদেবনারায়ণ (ভ্রাতা)	১৬৮০ "	২ "
৯।	মহীন্দ্রনারায়ণ (ভ্রাতৃপৌত্র)	১৬৮২ "	১২ "
১০।	রূপনারায়ণ (জ্ঞাতিভ্রাতা)	১৬৯৪ "	২০ "
১১।	উপেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৭১৪ "	১৯ "
১২।	দেবেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৭৬৩ "	২ "
১৩।	ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ (জ্ঞাতি ভ্রাতা)	১৭৬৫ "	৫ "
১৪।	রাজেন্দ্রনারায়ণ (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)	১৭৭০ "	২ "
১৫।	ধরেন্দ্রনারায়ণ (ভ্রাতুষ্পুত্র)	১৭৭২ "	২ "
১৬।	ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ (পিতা, ২য় বার)	১৭৭৪ "	৯ "
১৭।	হরেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৭৮৩ "	৫৬ "
১৮।	শিবেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৮৩৯ "	৮ "
১৯।	নরেন্দ্রনারায়ণ (দত্তকপুত্র)	১৮৪৭ "	১৬ "
২০।	নৃপেন্দ্রনারায়ণ[১] (পুত্র)	১৮৬৩ "	৪৮ "
২১।	রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৯১১ "	২ "
২২।	জিতেন্দ্রনারায়ণ (ভ্রাতা)	১৯১৩ "	৯ "
২৩।	জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ (পুত্র)	১৯২২ "	৪৮ "
২৪।	বিরাজেন্দ্রনারায়ণ (ভ্রাতুষ্পুত্র)	১৯৭০ "	বর্ত্তমান।

১ মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত কর্ণেল স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, জি, সি, আই, ই, সি, বি, তীরাহ যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করায়, মহারাণী ভারতেশ্বরী সি, বি, এই গৌরবাত্মক উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

বড় দেউরীদিগের বংশাবলী

১। রতিনাথ ঝা।

২। রামচন্দ্র ঝা।

৩। রঘুনাথ ঝা।

৪। শম্ভজীব ঝা।

৫। প্রদ্যুম্ন ঝা।

৬। বীরনারায়ণ ও হরপতি ঝা।

৭। গঙ্গাপ্রসাদ ঝা (বীরনারায়ণের পুত্র)।

৮। কৃষ্ণনারায়ণ, বিষ্ণুপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ ও শিবনারায়ণ ঝা।

৯। কালীপ্রসাদ ঝা (ভবানীপ্রসাদের পুত্র,
ভবানীপ্রসাদ বড় দেউরী বিদ্যমানে পরলোকগত হয়।)

১০। খড়্গনাথ ঝা (ভবানীপ্রসাদের কৃত্রিম পুত্র)

১১। যজ্ঞনাথ ঝা (খড়্গনাথ ঝার ১ম পুত্র)

১২। কাশীনাথ ঝা (খড়্গনাথ ঝার ২য় পুত্র)—বর্ত্তমান দেউরী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কামতাপুরের বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ

পুরাকালে কামরূপ বা আসাম কামপীঠ, মণিপীঠ, যোগিনীপীঠ এবং রত্নপীঠ এই চারি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রবল পরাক্রান্ত নরক ও তৎপর তদীয় পুত্র ভগদত্ত এই অংশ চতুষ্টয়ের আধিপত্য লাভ করেন। কোচবিহার উক্ত রত্নপীঠ নামক অংশের অন্তর্গত এবং ভগদত্তের কারাগার বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে ভগদত্তের কারাগার থাকুক বা না থাকুক কিন্তু এখানে যে তাঁহার কোন প্রকার প্রাসাদাদি ছিল, এবং ঐ সকল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দ্বারাই কামতাপুর নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। প্রাচীন কামতাপুর বা গোসানীমারি গ্রাম কোচবিহার রাজধানী হইতে ১৪ মাইল ব্যবধান দক্ষিণে সিংমারী নদীর তীরে অবস্থিত। এই রাজধানী উত্তরে শীতল আবাস হইতে দক্ষিণে শিলদুয়ার পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৬ মাইল। পশ্চিমে জয়দুয়ার ও বাঘদুয়ার হইতে পূর্ব্ব দিকে আলকঝাড়ী, ফুলবাড়ী ইত্যাদি গ্রাম পর্য্যন্ত ৭।৮ মাইল বিস্তৃত। ইহার তিন দিক বিস্তৃত মৃণ্ময় গড ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান আছে, কিন্তু ঐ সকল স্থানে প্রাচীন ভগ্নাবশেষের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে বোধ হয় ঐ সকল স্থান প্রকৃত রাজধানীর বহির্দ্দেশে অবস্থিত ছিল। কেবল শত্রু পক্ষের আক্রমণ নিবারণার্থে গড নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজধানীর উত্তর দিকের কতক অংশ হইতে পূর্ব্ব দিক পর্য্যন্ত গড়ের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ দিকে নদী ও সমস্ত ভূভাগ জঙ্গলে আবৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং বিপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না; বোধ হয় এই জন্যই ঐ দিকে গড় নির্ম্মিত হয় নাই।[1] সিংমারী নদী

১ এতৎ সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, রাজবাটী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। কিন্তু বাহিরের গড (মৃণ্ময় প্রাচীর) গৃহাধিষ্ঠাত্রী কান্তেশ্বরী দেবী মুসলমানদিগের আক্রমণের প্রাক্কালে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কান্তেশ্বরী কান্তেশ্বরকে চারি দিবস উপবাস থাকিতে বলেন, কিন্তু রাজা তিন দিবস মাত্র উপবাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাজেই তিন দিকের গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট অর্থাৎ ধরলানদীর দিকের গড় নির্ম্মিত হয় নাই।

রাজধানীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। তাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ বিস্তর নষ্ট হইয়াছে।

ডোঁ নাথের দীঘির পাড়ে ও আড়াবাড়ী নামক গ্রামে মুসলমান আক্রমণের অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিহীন প্রস্তরনির্ম্মিত বহুতর দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, ভগ্ন গৌরীপাট এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বহুতর প্রস্তর বিদ্যমান আছে। গড় যে কেবল মৃত্তিকাস্তূপ মাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল এমত বোধ হয় না। ইহার স্থানে স্থানে ইষ্টকাদির বাঁধ এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এবং অস্ত্রশস্ত্রে যে সজ্জিত ছিল তাহারও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঘ-দুয়ারের গড় কর্ত্তন করিয়া যে বর্ত্তমান রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, সে স্থানের গড় ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত ছিল। আর নদী কর্ত্তৃক যে স্থানে গড় ভগ্ন হইয়াছে, তথায় নদী গর্ভে দুইটী তোপ পাওয়া গিয়াছে, তাহার বৃহত্তরটি এখনও কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজধানীতে এবং ক্ষুদ্রতরটি অনেক দিন পর্য্যন্ত কমতেশ্বরীর বাটীতে রক্ষিত ছিল। কয়েক বৎসর হইল উহা কামার কারিতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কমতেশ্বরীর মন্দিরে মহিষ কাটার যে খড়্গ আছে, তাহাও নদীগর্ভে পাওয়া গিয়াছে এরূপ প্রবাদ আছে।

বর্ত্তমান গোসানীমারির বন্দরের বায়ুকোণে রাজপাট। রাজপাট একটি বিস্তৃত মৃত্তিকার স্তূপমাত্র। ইহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকাদি দ্বারা গ্রথিত। উপরে উঠিবার প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটি সোপানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজপাট হইতে দুই মাইল দক্ষিণে গড়, সিংমারী নদী কর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই ভগ্ন স্থানের উচ্চতা জলসীমা হইতে ন্যূনাধিক ৩০ হস্ত হইবে। গড়ের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান কমতেশ্বরীর মন্দিরের দক্ষিণাংশে একটি কাষ্ঠময় বাঁধের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ বাঁধ গড়ের অপর পার্শ্বস্থ সিংমারী নদীর গর্ভ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন এই বাঁধ বাররাঙ্গালায় ভৈরব ডাঙ্গির বাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঁধের অবস্থান দৃষ্টে বোধ হয় ইহা একটি গুপ্তদ্বার বা জলবর্ত্ম হইবে। নচেৎ গড়ের নিম্নদেশ দিয়া উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত এরূপ বাঁধ থাকিবার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। এই বাঁধের পশ্চিমাংশে প্রায় এক মাইল ব্যবধানে আর একটি কাষ্ঠময় সেতুর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সেতুর অবস্থান দৃষ্টে বোধ হয় এই স্থানে একটি পরিখা ছিল। দূর হইতে এই পাট একটি সুদৃঢ় টিলার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পাটের নিম্নদেশে পশ্চিম উত্তরাংশে রাজভবন ও পূর্ব্ব পার্শে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ

হয়। দক্ষিণাংশে বিস্তৃত অঙ্গন তৎপর একটি ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর, প্রাচীরের নিম্নদেশে পরিখা। পরিখার অপর পাড়ে আর একটি প্রাচীর, এই প্রাচীরের অনতিদূরে গোসানী-মঙ্গলের উল্লিখিত পেটেলা নামক সরোবর। এই সরোবর কোদাল ধোওয়া দীঘি হইতে দক্ষিণ দিকস্থ পরিখা পর্য্যন্ত দুই মাইল বিস্তৃত ছিল। অধুনা এই সরোবর নলবাড়ী নামে খ্যাত। রাজভবনের চতুর্দ্দিক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

রাজপাট হইতে এক মাইল ব্যবধান অগ্নিকোণে টাঁকশাল। টাঁকশাল হইতে রাজপাট পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত সড়কের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে একটি ক্ষুদ্র গড় বা প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। কয়েক বৎসর হইল টাঁক-শালের ভিত খনন করিয়া কতকগুলি প্রস্তর বাহির করা হইয়াছে; ঐ সকল প্রস্তর চূণ ও সুরকী দ্বারা গ্রথিত। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, এইগুলি গৃহস্তম্ভ স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। টাঁকশালের তিন মাইল উত্তরে মোগলকাটা নামক কুড়া; এই কুড়ার মধ্যে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত পুল আছে। এই পুল দৃষ্টে বোধ হয় ইহা রাজধানীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ পরিখার সেতু স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গোসানী-মঙ্গলের মতে কান্তেশ্বর এক পুরুষের রাজা এবং লক্ষ্ণৌর[১] নবাব কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হন। কিন্তু আসাম ইতিহাস প্রণেতা রবিন্‌সন্ সাহেব নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর এই তিনজন রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই নীলাম্বর বা কান্তেশ্বরই গৌড়ের তদানীন্তন নবাব আলাউদ্দীন হোসেন কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হন।

১ গৌড়ের তদানীন্তন রাজধানীর নাম লক্ষ্মণাবতী ছিল। বোধ হয় লক্ষ্মণাবতীকেই গ্রন্থকার লক্ষ্ণৌ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সমাপ্ত